ত্রৈমাসিক

জেনে চলবো, ভালো থাকবো

বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবো

আমার স্বাস্থ্য

১ম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ ভাদ্র ১৪২৫ ■ আগষ্ট ২০১৮ ■ হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার এর একটি প্রকাশনা

শিশুর পুষ্টি

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা জরুরি

শিশুদের রক্তশূন্যতা

রক্তশূন্যতা দূর করার উপায়

ঘাড় ও কোমর ব্যথায় আধুনিক চিকিৎসা

স্তন ক্যান্সার ঃ জানতে হবে

ক্যালসিয়াম কেন খাবেন?

এলার্জিজনিত রোগ ও চিকিৎসা

রাতে খাবার সেরি করে খেয়ে নিজেই বাড়াচ্ছেন ক্যানসারের ঝুঁকি!

ফুলফুল ভালো মাথায় ব্যায়াম

মাথা ব্যথা

নিজের অধিকার আদায় আর নিজের সম্মান রক্ষায় নিজেকেই সোচ্চার হতে হবে সেই সাথে হতে হবে আত্মবিশ্বাসী , সাহসী আর কৌশলী --জওশন আরা রহমান

মোহনা (বিল্ডিং-৩)

২২ ও, আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

ON TIME DELIVERY
WITH QUALITY
..... IS OUR MOTO

অভিজাত এলাকায়, স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের কোল ঘেষে অবস্থিত মোহনা প্রকল্পে রয়েছেঃ

* ৫-স্তর বিশিষ্ট পার্কিং
* ১৬৭২ ও ১৬৯২ বর্গফুটের ফ্ল্যাট
* নাগরিক জীবনে নিরাপত্তাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সুবিধাসমূহ
* ছেলে-মেয়েদের জন্য বিনোদন পার্ক
* আধুনিক সুপরিসর কমিউনিটি হল

বেক্সিমকো রিয়েল এস্টেট ডিভিশন

ঢাকা অফিস:
মোবাইল :০১৯১১-৬৪৯৩২৯
০১৭১১-৮১২৪৯৭, ০১৭১১-৫২২০৩৫

চট্টগ্রাম অফিস:
মোবাইল : ০১৭১০-৮০৫৩৮০
০১৯১১-৬৪৯৩২৯, ০১৭১১-৮১২৪৯৭

ত্রৈমাসিক

আমার স্বাস্থ্য

জেনে চলবো, ভালো থাকবো বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবো

এর সম্মানিত লেখক, পাঠক, কলাকুশলী ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

সম্পাদকের টেবিল থেকে

‘আমার স্বাস্থ্য’ ম্যাগাজিনের ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আপনাদের কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে বলে আপনাদের প্রতি আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা আপনাদের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে। এ সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কিডনী সুস্থ রাখার উপায়।

আমরা যারা অসুস্থ আছি, তারা বুঝতে পারছি সুস্থ থাকার মূল্য কতটুকু! আমাদের মধ্যে যারা কিডনী রোগে আক্রান্ত, তাদের কাছে কিডনী নামক এই প্রয়োজনীয় অর্গানটি কতো মূল্যবান, বুঝতে পারছি।

তাই মানবদেহের এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্গানটিকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদেরকে সঠিক খাদ্যাভাসের সাথে সাথে নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইক্লিং করা বা সাঁতার কাটার মতো হাল্কা ব্যায়াম করে শরীরকে কর্মঠ ও সতেজ রাখতে হবে। কর্মঠ ও সতেজ শরীরে অন্যান্য যে কোনো রোগ হবার মতো কিডনী রোগ হবার ঝুঁকিও খুব কম থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত ওজন, রক্তের অনিয়ন্ত্রিত সুগার, ধূমপান, কিডনী রোগ হবার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয় । কাজেই আমাদের সবার উচিত হবে বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা ।

অটিজম এক প্রকার স্নায়ুর বিকাশজনিত সমস্যা যাতে শিশুর মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ বাধাগ্রস্থ হয় । গবেষকদের মতে এটি প্রধানত বংশগত । তবে পরিবেশগত প্রভাবকও এ রোগের কারণ হিসেবে বিবেচিত। যদিও এ রোগের কোন নিশ্চিত প্রতিকার নেই, তবুও তাড়াতাড়ি এ রোগ নির্ণয় করে দ্রুত স্পিচ ও বিহেভিয়েরাল থেরাপি দেয়া সম্ভব হলে তা শিশুর বিকাশে অনেক উপকার করে ।

নারী উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশে কাজ করার পথিকৃৎ জওশন আরা রহমানকে নিয়ে রয়েছে এক বিশেষ প্রতিবেদন যা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে নারী উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিয়ে কথা বলতে।

‘আমার স্বাস্থ্য’ এর সম্মানিত পাঠক , লেখক , ম্যাগাজিনের পেছনের মানুষগুলো, যারা বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

সব পাঠকদের জন্য রইলো আন্তরিক শুভ কামনা। আপনাদের সবার সুখী ও সুস্থ জীবন আমাদের প্রত্যাশা।

গভীর শ্রদ্ধাসহ,

আইভি খান ওয়াহিদ

বর্ষঃ ০১, সংখ্যাঃ ০২, ভাদ্র ১৪২৫, আগস্ট ২০১৮

মূল্যঃ ৫০ টাকা।

ত্রৈমাসিক
আমার স্বাস্থ্য
জেনে চলবো, ভালো থাকবো বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবো

বাড়ী নং #২১, রোড নং #১২, পুরাতন (৩১)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
ফোনঃ +৮৮ ০১৭৪৮ ৩৪৮৬২১
ইমেইলঃ hhhealth2015@gmail.com

উপদেষ্টা পর্ষদ
অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আক্তার
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুর রহিম
মেজর (অবঃ) পারভেজ হাসান, পি.এস.সি

সম্পাদক
আইভি খান ওয়াহিদ

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ শাকিল তানভির

সহ সম্পাদক
ডাঃ শায়লা আজিজ
ডাঃ রোখসানা আফরোজ
ডাঃ আসিফ ইয়াজদানী

গ্রাফিক ডিজাইনার
উম্মে হানী সারা

"আমার স্বাস্থ্য" হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ম্যাগাজিন।

কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

সূচিপত্র

আপনার কিডনী দু'টো ভালো আছে তো? জানুন, সচেতন হোন এবং সুস্থ থাকুন ০৪
শিশুর পুষ্টি ১২
শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা জরুরি ১৫
শিশুদের রক্তশূন্যতা ১৭
রক্তশূন্যতা দূর করার উপায় ২০

মূত্রনালীর সংক্রমণ: লক্ষণ ও চিকিৎসা ২১
ঘাড় ও কোমর ব্যথায় আধুনিক চিকিৎসা ২২
কিডনী কি ও কিছু মৌলিক তথ্যঃ ২৫
দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ ঃ এক নীরব ঘাতক ২৯

অঠিক রোগ নির্ণয় বিড়ম্বনাময় ঃ বাতজ্বর (Rheumatic fever) বিড়ম্বনা ৩৪
বাড়তি মেদ ঝরাতে টমেটোর কেরামতি ৩৭
স্তন ক্যান্সার ঃ জানতে হবে ৩৮
ক্যালসিয়াম কেন খাবেন? ৪০
রাতে খাবার দেরি করে খেয়ে নিজেই বাড়াচ্ছেন ক্যানসারের ঝুঁকি! ৪৪
এলার্জিজনিত রোগ ও চিকিৎসা ৪৬
ডিজেনারেশন ৪৯

ঘরোয়া চিকিৎসা ৫০
অটিজম ৫২
ফুসফুস ভালো রাখার ব্যায়াম ৫৫
কৃমি থেকে শিশুর সুরক্ষা ৫৬
মাথা ব্যথা ৫৭
বন্ধুত্ব সুস্থ জীবনের জন্য ৫৮
রান্নার সহবত ৬০
নিজের অধিকার আদায় আর নিজের সম্মান রক্ষায় নিজেকেই সোচ্চার হতে হবে সেই সাথে হতে হবে আত্নবিশ্বাসী , সাহসী আর কৌশলী --জওশন আরা রহমান ৬২

ছবি: ইন্টারনেট

আপনার কিডনী দু'টো ভালো আছে তো? জানুন, সচেতন হোন এবং সুস্থ থাকুন

আমার বড় মামী মারা গেছেন প্রায় দেড় বছর আগে। মারা গেছেন হাসপাতালে। তিনি আইসিইউতে ছিলেন একমাসের মত। এর মাঝে লাইফ সাপোর্টেই ছিলেন দুই সপ্তাহের বেশি সময়। শেষ দিকে আমি মামীকে দেখতে গিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে আসতাম। কারণ এই অবস্থায় তাকে দেখার সাহস আমার ছিল না। একদিন সাহস করে দেখে এসে সারারাত ঘুমাইনি। ভেবেছিলাম আমার মামাতো ভাইকে বলবো মামীকে লাইফ সাপোর্টে রেখে আর কষ্ট দিওনা । বলা হয়নি। তার আগে আরেকদিনও একই কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল মামীকে কষ্ট দিও না, যেদিন মামীকে ডায়ালাইসিস করা হয়। মামী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন হঠাৎ করে শুরু হওয়া বুক ব্যথা নিয়ে । চিকিৎসাধীন অবস্থায় মামীর ক্রিয়েটিনিন অনেক বেড়ে গিয়েছিল, চিকিৎসকদের উপায় ছিলনা ডায়ালাইসিস ছাড়া। কিন্তু ডায়ালাইসিস চাইলেই তো করা যায় না, রোগীর শরীরের সক্ষমতা থাকতে হয় জটিল এই চিকিৎসা নিতে। মূলত ডায়ালাইসিস হলো রক্তের বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ যন্ত্রের মাধ্যমে ছেঁকে পরিশোধিত করে বিষমুক্ত রক্ত আবার শরীরে প্রবেশ করানো। আমি মামীর ২য় ডায়ালাইসিসের দিন তার সাথে ছিলাম। মামী কষ্টে চিৎকার করছিলেন হাত দিয়ে নল খুলে ফেলতে চাচ্ছিলেন। তারা বাধ্য হয়ে মামীর হাত পা বেঁধে রেখেছিলেন খাটের সাথে। আমি তার কান্না নিতে পারিনি বেরিয়ে এসেছিলাম কাদঁতে কাদঁতে। মনে মনে বলেছিলাম আল্লাহপাক এ কষ্ট যেন কোন মানুষকে না দেন। এক একটা সেশনে ৩-৪ ঘন্টা লাগতো। মামী অবশ্য ২টা-৩টার বেশী নিতে পারেন নি । অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে মামীর কখনও কিডনী রোগ ছিলনা এবং তিনি মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। চলে যাবার বছর খানেক আগে কিডনী সমস্যা ধরা পড়েছিল কিন্তু প্রথম অবস্থায়

প্রচ্ছদ

ডাক্তাররা ঔষধ দিয়েই চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। পরে জেনেছিলাম মামীর কিডনীর অসুখ যখন ধরা পড়েছিল তখনই ডাক্তাররা বলেছিলেন কিডনী প্রতিস্থাপনই এর চিকিৎসা কিন্তু মামীর শারীরিক অবস্থা আর বয়স অনুকূলে না থাকায় সেই ঝুঁকি নিতে ডাক্তাররা আগ্রহী হন নি। তাই ঔষধ দিয়েছিলেন সাময়িক সুস্থতার জন্য। অথচ মামীর তেমন কোন লক্ষণও ছিল না যে আমরা সাধারণরা বুঝবো তার কিডনী রোগ হয়েছে। তাছাড়া তিনি মোটামুটি নিয়মিত ডাক্তার দেখান, তার ডায়াবেটিস বা হার্টেও সমস্যা ছিল না। কাশির সমস্যা ছিল সবসময়। তখন ভাবলাম মামীর যদি এ অবস্থা হয় তাহলে দেশের সাধারণ মানুষ বা দরিদ্র মানুষদের কি অবস্থা? তারা তো মুমূর্ষু হবার আগে হাসপাতালেই আসে না। আর খাবার দাবারের তো আজকাল যে হাল !

ডায়াবেটিস , উচ্চ রক্তচাপ কিডনী রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

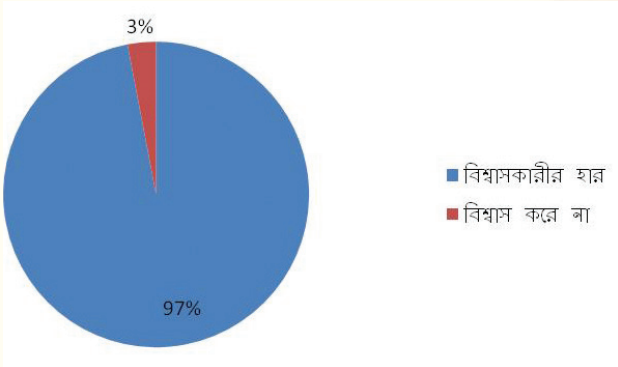

এভাবে দেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে জটিল সব রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। রোগ শনাক্ত করার সময়টাও পাওয়া যায় না অনেক সময়। আবার শনাক্ত করা গেলেও চিকিৎসা শুরু করতে করতে প্রাণ হারায় রোগী। অনেক সময় সব ঠিক থাকলেও চিকিৎসা ব্যয় বহন করার ক্ষমতা থাকে না অনেকের । আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি হয় দীর্ঘমেয়াদী যেটা চালিয়ে যাওয়া যেমন কারো কারো জন্য কঠিন হয়ে পড়ে আবার রোগীর শারীরিক শক্তিও থাকে না চিকিৎসা গ্রহণের। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কিডনী রোগের কথা ধরা যাক। দেশে বর্তমানে বছরে ৪০ হাজার লোক মারা যায় কিডনী রোগে।

বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

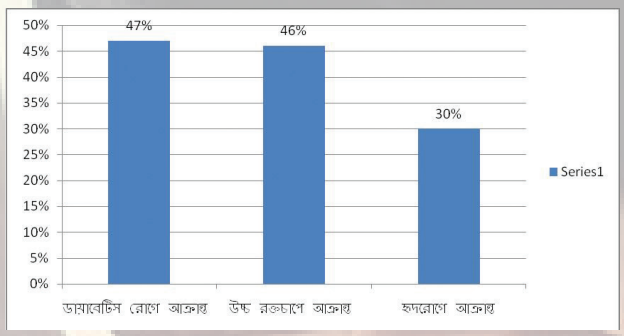

আমাদের দেশের মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতন লোকের সংখ্যা অনেক কম। রোগে না ভুগলে ডাক্তারের কাছে আমরা খুব একটা যাই না। ইদানীং দেখা যায় একরোগের জন্য চিকিৎসা করতে গিয়ে ধরা পড়ছে অন্যরোগের । তখন ডাক্তাররা পড়েন বিপাকে কারণ এক রোগের ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বেড়ে যেতে পারে অন্যরোগের তীব্রতা। যেমন স্ট্রোক করে হাসপাতালে ভর্তি থাকা কোন রোগীর যদি কিডনী রোগ ধরা পড়ে এবং অবস্থা যদি খারাপ থাকে এবং ডায়ালাইসিস দিতে হয় তখন এই চিকিৎসা করা ডাক্তারের জন্য এবং রোগী দুইয়ের জন্য জটিল, খরচের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিডনী রোগ এক নীরব ঘাতক। স্বাভাবিক ভাবে একটু সচেতন না হলে এ রোগ ধরা পড়তে পড়তে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। তখন চিকিৎসা হিসাবে কিডনী প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা

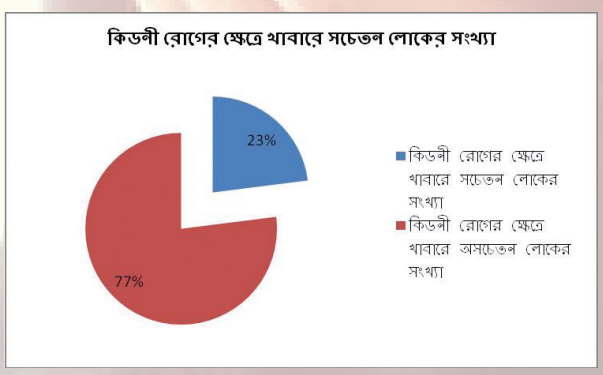

প্রচ্ছদ

দেখা দেয়। এই চিকিৎসা ব্যয় বহুল এবং জটিল। আর বেশি খারাপ অবস্থায় মানে কিডনী অকেজো হয়ে গেলে ডায়ালাইসিস ছাড়া উপায় নাই যা যথেষ্ট কষ্টকর আর ব্যয়বহুল চিকিৎসা। অথচ একটু সচেতন থাকলে আমরা এই কষ্টকর রোগ হতে নিরাপদ থাকতে পারি।

দেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ৫০০ জন মানুষের মধ্যে কিডনী বিষয়ক সচেতনতা সম্পর্কিত জরিপে দেখা গেছে ৫০০ জনের ৪৭% মানুষই ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত , ৪৬ % আক্রান্ত উচ্চ রক্তচাপে এবং ৩০% মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত। আর চিকিৎসকদের মতে এসব রোগে আক্রান্ত মানুষের কিডনী রোগ হবার ঝুঁকি বেশি এবং জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৯৭ % মানুষই বিশ্বাস করেন এসব রোগ কিডনী রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

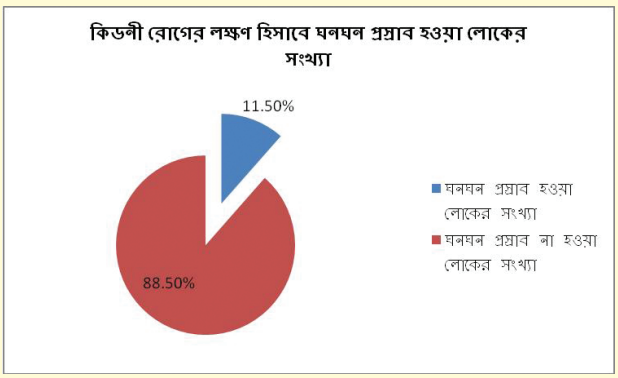

দেশে বর্তমানে ৪০ হাজারেরও বেশি কিডনী রোগী থাকলেও জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৯৬% লোকই জানে না ক্রিয়েটিনিন কি। কিডনী রোগ প্রতিরোধে ধুমপান হতে বিরত থাকা উচিত বলে মনে করেন ৯৯% মানুষ কিন্তু ৫০০ জনের মধ্যে ধূমপান কারীর সংখ্যা ৮৭% যা কিডনী রোগ হবার ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। কিডনী সুস্থ রাখার ব্যাপারে সচেতন লোকের সংখ্যা ২৫.৫%। কিডনী রোগের লক্ষণ হিসাবে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া লোকের সংখ্যা ১১.৫% । নিয়ম করে কিডনী পরীক্ষা করান এমন লোকের সংখ্যা ৩% তাও সেটা ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ার পর। কিডনী রোগ একটি মারাত্মক রোগ এটি মানেন ১০০% মানুষ, কিন্তু এ ব্যাপারে খাবারে

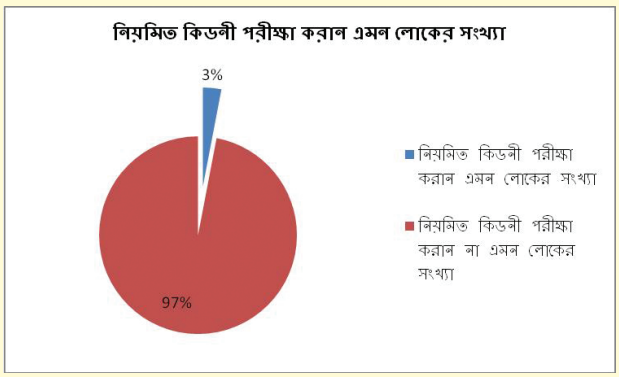

সচেতন লোকের সংখ্যা মাত্র ২৩%। কিডনী রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত ব্যায়াম করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন ৮৭% মানুষ কিন্তু ব্যায়াম করেন ৪৭% মানুষ। কিডনী রোগ হলে এর চিকিৎসা কি এটা জানেন মাত্র ২৯% মানুষ। দীর্ঘমেয়াদী কিডনী রোগের একমাত্র চিকিৎসা ডায়ালাইসিস এটা জানেন ২৩% মানুষ। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে কিডনী রোগ ঔষধে সারে বলে বিশ্বাস করে ৪৩% মানুষ অথচ কিডনী রোগ সনাক্ত করতে করতেই কিডনীর অবস্থা হয়ে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ। কিডনী ট্রান্সফার করলে মানুষ ভালো হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করে ৪৬% মানুষ। কিডনী রোগে খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে ১০০% মানুষ। নিয়মিত ২-৩ লিটার পানি পান করা লোকের সংখ্যা ৪৬% আর ৩-৪ লিটার ২৪% ১-২ লিটার পানি পান করা লোকের সংখ্যা ২৫% আর ৪ লিটারের অধিক পানি পান

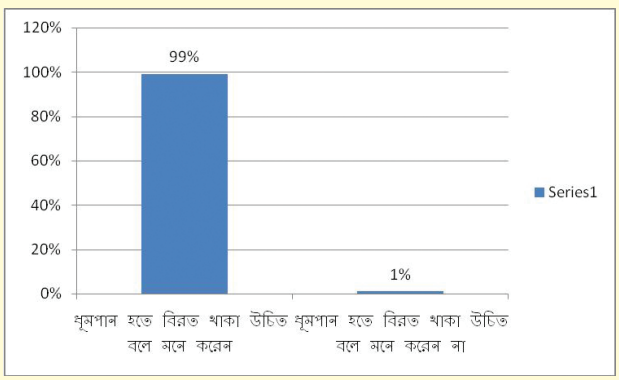

করা লোকের সংখ্যা ৫%। দৈনিক ৬-৭ বার প্রস্রাব করা লোকের সংখ্যা ৩৪% , ৪-৫ বার প্রস্রাব করা লোকের সংখ্যা ৩৬% , ৮-৯ বার প্রস্রাব করা লোকের সংখ্যা ২০% আর এর চেয়ে অধিক প্রস্রাব করা লোকের সংখ্যা ১০%। কিডনী রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন ১০০% লোক।

সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণগুলো যদি জানা থাকে তাহলে অনেকটাই সচেতন হয়ে চলা যায় এই ভয়ানক রোগ থেকে। আসুন দেখে নিই কিডনী সমস্যার মূল কারণগুলো-

১) উচ্চ রক্তচাপ।
২) রক্তে অধিক পরিমাণ কোলেস্টেরল।
৩) ডায়াবেটিস
৪) বংশে কারও কিডনীর সমস্যাও অনেক সময় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

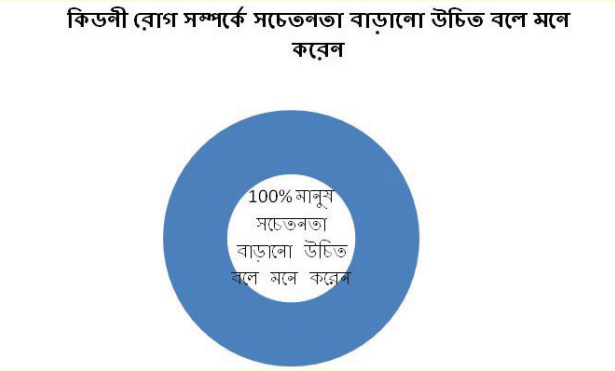

৫) পলিসিস্টিক কিডনী ডিজিস- এই রোগের ফলে কিডনী তে সিস্ট গঠিত হয়।
৬) দীর্ঘ দিন ধরে লিথিয়াম এবং নন-স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি (NSAIDs) ঔষধ খাওয়ার ফলেও সমস্যা তৈরী হয়।
৭) ওজন বাড়া ও ধূমপান কিডনী সমস্যার একটা অন্যতম কারণ।
৮) ষাট বা তার বেশি বয়সে অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা দেয়।

কিডনী মানব দেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ, যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমাদের দেহে তৈরী হওয়া ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ সমূহ ছাঁকন প্রক্রিয়ায় প্রস্রাবের মাধ্যমে

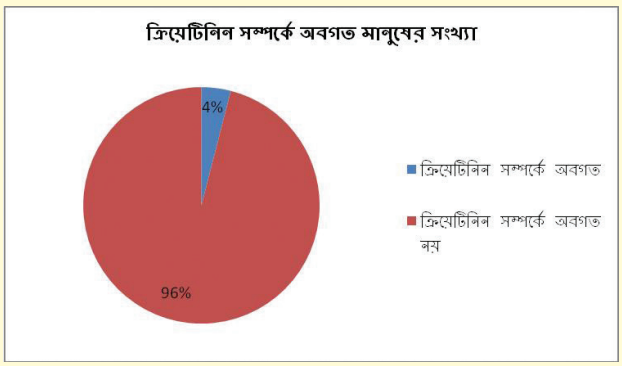

শরীরের বাইরে নির্গত হয়। এই কিডনী যখন অচল হয়ে পড়ে, তখন ভোগান্তির অন্ত থাকেনা। আজকাল সমাজের প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কেউ না কেউ এই ভোগান্তি পোহাচ্ছেন। কিডনী ফেইলুর বা কিডনী রোগে আজ শত শত মানুষ আক্রান্ত, কিন্তু আমরা কি জানি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে সহজেই এই রোগ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব বা এই রোগের ভোগান্তি থেকে অনেকাংশেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব! আসুন তাহলে জেনে নেই কিভাবে আপনার কিডনী কে সুস্থ রাখবেনঃ-

১। কর্মঠ থাকুনঃ নিয়মিত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইক্লিং করা বা সাঁতার কাটার মতো হাল্কা ব্যায়াম করে আপনার শরীরকে কর্মঠ ও সতেজ রাখুন। কর্মঠ ও সতেজ শরীরে অন্যান্য যেকোন রোগ হবার মতো কিডনী রোগ হবার ঝুঁকিও খুব কম থাকে।

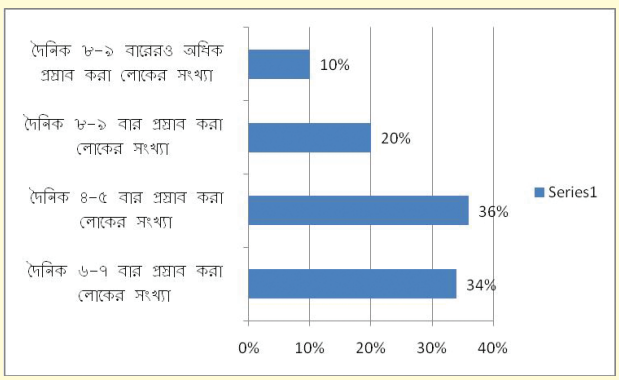

প্রচ্ছদ

২। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন : ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৫০ জনই কিডনী রোগে আক্রান্ত হন। রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কিডনী নষ্ট হবার ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন,নিয়মিত আপনার রক্তের সুগার পরীক্ষা করিয়ে দেখুন তা স্বাভাবিক মাত্রায় আছে কি না, না থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শুধু তাই নয় অন্তত ছয় মাস পর পর হলেও একবার আপনার কিডনী পরীক্ষা করিয়ে জেনে নিন সেটা সুস্থ আছে কিনা।

৩। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন : অনেকেরই ধারণা যে উচ্চ রক্তচাপ শুধু ব্রেইন স্ট্রোক (Stroke) আর হার্ট এটাকের MI(Mayocardial Infarction) এর ঝুঁকি বাড়ায়, তাদের জেনে রাখা ভালো যে কিডনী ফেইলিউর হবার প্রধান কারণ হল অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ। তাই এ

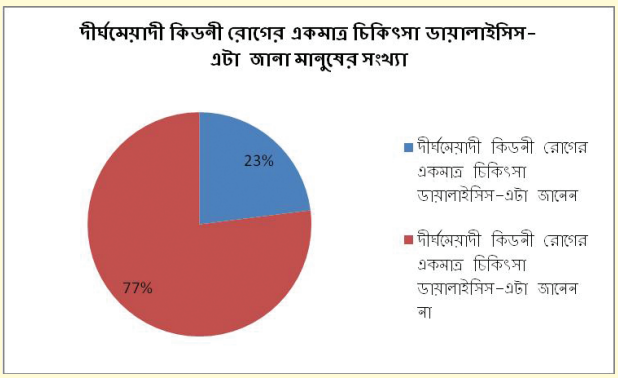

রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কোন কারণে তা ১৪০/৯০ মি.মি. মার্কারী এর বেশি হলে সাথে সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিয়মিত ঔষধ সেবন এবং তদসংক্রান্ত উপদেশ মেনে চললেই সহজেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৪।পরিমিত আহার করুন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন : অতিরিক্ত ওজন কিডনীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সুস্থ থাকতে হলে ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসতে হবে। পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে কিডনী রোগ হবার ঝুঁকি অনেক কমে যায়। অন্য দিকে হোটেলের তেলমশলা যুক্ত খাবার, ফাস্টফুড, প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে রোগ হবার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে যায়। মানুষের দৈনিক মাত্র ১

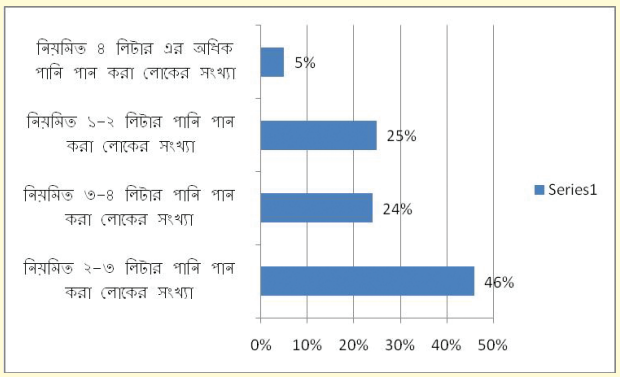

চা চামচ লবণ খাবারে প্রয়োজন আছে।খাবারে অতিরিক্ত লবন খাওয়াও কিডনী রোগ হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই খাবারে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করুন।

৫। ধূমপান পরিহার করুন: অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কিডনী ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ গুণ বেশি। শুধু তাই নয় ধূমপানের কারণে কিডনী তে রক্তপ্রবাহ কমে যেতে থাকে এবং এর ফলে কিডনীর কর্মক্ষমতাও হ্রাস পেতে শুরু করে। এভাবে ধূমপায়ী একসময় কিডনী ফেইলিউর রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

৬। অপ্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন : আমাদের মাঝে অনেকেরই বাতিক রয়েছে প্রয়োজন / অপ্রয়োজনে দোকান থেকে ঔষধ কিনে খাওয়া। এদের মধ্যে ব্যথার ঔষধ (Analgesic) রয়েছে শীর্ষ তালিকায়। জেনে

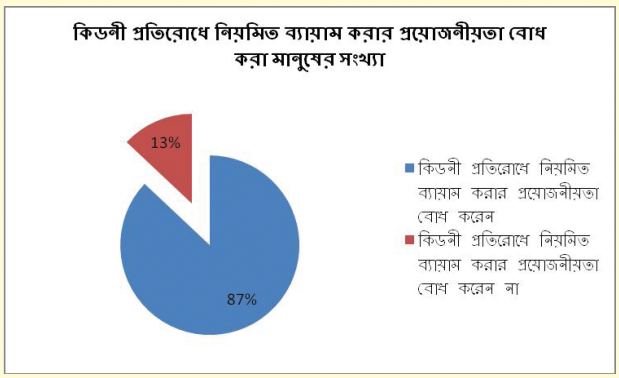

প্রচ্ছদ

রাখা ভাল যে প্রায় সব ওষুধই কিডনীর জন্য কমবেশি ক্ষতিকর আর এর মধ্যে ব্যথার ঔষধ সবার চেয়ে এগিয়ে। নিয়ম না জেনে অপ্রয়োজনীয় ঔষধ খেয়ে আপনি হয়তো মনের অজান্তেই আপনার কিডনীকে ধ্বংস করে যাচ্ছেন -তাই যে কোন ঔষধ ব্যবহারের আগে অবশ্যই নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিন তা আপনার ক্ষতি করবে কি না।

৭। নিয়মিত কিডনী পরীক্ষা করান : আমাদের মাঝে কেউ কেউ আছেন যাদের কিডনী রোগ হবার ঝুঁকি অনেক বেশি, তাদের অবশ্যই নিয়মিত কিডনী পরীক্ষা করানো উচিত। কারো যদি ডায়াবেটিস অথবা উচ্চ রক্তচাপ থাকে, ওজন বেশি থাকে (স্থূলতা / Obesity), পরিবারের কেউ কিডনী রোগে আক্রান্ত থাকে তা হলে ধরে নিতে হবে তার কিডনী রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই এসব কারণ থাকলে অবশ্যই নিয়মিত কিডনী পরীক্ষা করাতে হবে।

কিডনী ফেইলিউর হয়ে গেলে ভালো হয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই, ডায়ালাইসিস কিংবা প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant) করে শুধু জীবনকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব। তাই এই রোগ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা প্রতিটি সুস্থ মানুষের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সাথে সাথে সচেতন হতে হবে খাবার গ্রহণের প্রতিও।

চীনের একটি প্রবাদ আছে- খাদ্যাভ্যাস থেকে রোগ। সেজন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন খাবারের উপকারী বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে চলেছেন। কিডনী সুরক্ষায় বিশেষ খাদ্য হিসাবে এরকম কিছু খাবারকে নিশ্চিত করেছে বিশেষজ্ঞরা।

- **ক্যাপসিকাম:** আপনার কিডনী সুস্থ রাখতে ক্যাপসিকাম হতে পারে প্রথম পছন্দ। সালাদ এবং যে

জেনে রাখুন

- দেশে বর্তমানে কিডনী রোগীর সংখ্যা এক কোটি ৮০ লাখ
- প্রতিবছর মারা যায় ৪০ হাজার
- কিডনি নষ্ট হলে ডায়ালাইসিস করে চিকিৎসা করার সামর্থ্য বাংলাদেশে ১০ শতাংশেরও নেই
- সচেতন হলে স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ করা সম্ভব
- বর্তমান ধারায় কিডনী রোগী বৃদ্ধি পেলে ২০২০ সালে বাংলাদেশে তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ ক্রনিক কিডনী রোগে আক্রান্ত হবে
- বাংলাদেশে বর্তমানে দুই কোটি লোক কোন না কোন কিডনী রোগে আক্রান্ত
- বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার রোগী ধীরগতিতে কিডনী অকেজো হয়ে প্রতিবছর অকালে মৃত্যুবরণ করে
- অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যথানাশক ঔষধের ব্যবহার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কিডনী রোগের কারণ হতে পারে
- আকস্মিক কিডনী বিকল রোগে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা অনেক রোগীকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়

কোনো রান্নাকে সুস্বাদু করতে এর জুড়ি নেই। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, বি৬, ফলিক এসিড এবং ফাইবার। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ এন্টিঅক্সিডেন্ট লাইকোপিন এর প্রধান উপাদান, যা কিনা ক্যান্সার প্রতিরোধেও সহায়ক।

- **বাঁধাকপি ও ফুলকপি:** বাঁধাকপি ও ফুলকপিকে এন্টিঅক্সিডেন্ট এর খনি বললেও ভুল হবে না। এরা শরীরের ক্ষতিকারক ফ্রি রেডিকেলস এর বিরুদ্ধে কাজ করে আপনার কিডনী কে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধেও কাজ করে। দামে সস্তা হলেও এতে রয়েছে ভিটামিন কে, সি, বি৬, ফলিক এসিড। প্রচুর ফাইবার সমৃদ্ধ বাঁধাকপি হতে পারে আপনার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার অন্যতম উপাদান। ফুলকপির একটি বিশেষ গুণ হলো এটি শরীর থেকে বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান দূর করতে সহায়তা করে।

- **রসুন:** রসুনের গুণের কথা আমাদের সবারই জানা। এটি কিডনী প্রদাহ উপশম করার পাশাপাশি রক্তে কোলেস্টেরোলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিডনী রোগীদের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

- **পেঁয়াজ:** পেঁয়াজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ফ্লাভনয়েড, যা রক্তনালীতে চর্বি জমা প্রতিহত করে। এর এন্টিঅক্সিডেন্ট কিডনী জনিত উচ্চরক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ক্যান্সার প্রতিরোধেও এর ভূমিকা রয়েছে।

- **আপেল:** বলা হয়ে থাকে প্রতিদিন একটি করে আপেল খেলে ডাক্তার থেকে দূরে থাকা যায়। নিয়মিত আপেল খাওয়ার অভ্যাস করলে তা কিডনীর স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও রক্তে কোলেস্টেরোল কমাতে, হৃদরোগ এবং ক্যান্সার প্রতিরোধেও এর ভূমিকা অনন্য।

- **লাল আঙুর:** এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফ্লাভনয়েড, যা আপনার কিডনীকে রাখবে সদা তরুণ। এটি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে এবং ক্যান্সার প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

- **ডিমের সাদা অংশ:** আমরা অনেকেই স্বাস্থের কথা চিন্তা করে ডিমকে খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেই। কিন্তু আপনি কি জানেন ডিমের সাদা অংশই হচ্ছে বিশুদ্ধ প্রোটিন, যা আপনার কিডনীর জন্য খুবই দরকারী।

- **মাছ:** মাছকে বলা হয়ে থাকে নিরাপদ প্রোটিনের উৎস। দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে মাংসের চেয়ে মাছের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি মাছে রয়েছে ওমেগা ৩ যা কিডনী, হার্ট এবং লিভারের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী। এছাড়াও কোলেস্টেরোল কমাতে এর ভূমিকা তো রয়েছেই।

- **অলিভ ওয়েল:** গবেষণায় দেখা গেছে যেসব দেশে অন্যান্য তেলের চেয়ে অলিভ ওয়েল বা জলপাই এর তেল ব্যবহার করা হয় সেসব দেশে কিডনী রোগী, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি তুলনামূলক কম হয়। অলিভ ওয়েলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পলিফেনল যা এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে চমৎকার কাজ করে। রান্নায় অথবা সালাদে অলিভ ওয়েল ব্যবহার বাড়তি স্বাদ যোগ করে।

নাজনীন নাহার
লেখক ও সাংবাদিক

LET THE BANK MATCH
YOUR DAILY SCHEDULE

DHAKA BANK GO

Experience the modern day banking app for your smartphone that makes banking easier than ever.

The Mobile App Includes Following Features:

- Account Details
- Balance Inquiry
- Bills Pay
- Mobile Top-up
- Fund Transfer
- Service Request
- Current Offers/Promotions
- Discount Partners
- SWIPE IT/EMI Partners
- Branch/ATM Locator

And many more…

Available at:

Google play | App Store

For more information please call: 16474
For ISD or overseas call: **+8809678016474**

www.dhakabankltd.com

DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING

শিশুর পুষ্টি

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় খাবারের পুষ্টিমান রক্ষা করার বিকল্প নেই। শিশুকে কিভাবে খাওয়াতে হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেক পিতা-মাতার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিশুর সঠিক ও পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যে খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন তা এখানে আলোচনা করা হল।

মায়ের দুধ : খুব সংক্ষেপে যদি শিশুর পুষ্টি সম্পর্কে বলতে হয় তাহলে শুরুতেই বলতে হবে মায়ের দুধের কথা। শিশুর জন্মের এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খেতে দিতে হবে এবং পূর্ণ ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। কারণ মায়ের দুধে বিদ্যমান পুষ্টি উপকরণ এ সময়ে শিশুর পুষ্টির চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে। পূর্ণ ৬ মাস থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির অর্ধেক চাহিদা এবং ১২ মাস থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা পূরণ হয় মায়ের দুধ থেকে। কাজেই পূর্ণ ছয় মাস বয়সের পর পরিবারের অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খেতে দিতে হবে এবং পূর্ণ ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।

ঘরের তৈরি খাবার : পূর্ণ ৬ মাস বয়সের পর শিশুর পাকস্থলী দুধ ছাড়াও অন্যান্য আমিষ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণে সমর্থ হয়ে ওঠে এবং শুধু মায়ের দুধ এ সময়ে শিশুর পুষ্টি পূরণ করতে পারে না। তাই পূর্ণ ৬ মাস বয়সের পর ঘরের তৈরি খাবার শুরু করতে হয়। এ সময়ে শুরুতে বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুকে অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাবারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন প্রকার খাবার একসাথে না দিয়ে একটির পর একটি খাবারে শিশুকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। বুকের দুধ ছাড়াও ৬ থেকে ৮ মাস বয়সের শিশুর জন্য প্রতিদিন ২০০ কিলো ক্যালরি, ৯ থেকে ১১ মাসের শিশুর জন্য ৩০০ কিলো ক্যালরি এবং ১২ থেকে ২৩ মাস বয়সের শিশুর জন্য ৫৫০ কিলো ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয়।

ঘরের তৈরি খাবার শুরু করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খাবারটি পুষ্টিকর হয় এবং শিশু সহজে হজম করতে পারে। খাবারের উপকরণগুলো সহজলভ্য হতে হবে এবং খাবার তৈরির সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হবে। শিশুর জন্য তৈরি করা খাবারের ঘনত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে খাবারটি যেন অতিরিক্ত পাতলা না হয়। এতে পুষ্টির ঘাটতি হবে। আবার অতিরিক্ত শক্ত খাবার শিশু খেতে পারবে না এবং তার হজমে অসুবিধা হবে। ৬ থেকে ৮ মাস বয়সের শিশুকে আধা বাটি (২৫০ মিলির বাটি) করে দিনে ২ বার, ৯ থেকে ১১ মাস বয়সের শিশুকে আধা বাটি করে দিনে ৩ বার এবং ১২ থেকে ২৩ মাস বয়সের শিশুকে এক বাটি করে দিনে ৩ বার পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে। এছাড়া সকল শিশুকে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে।

খাদ্য তালিকা :

শিশুকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ ধরণের খাবার খাওয়াতে হবে যথা- ১) ভাত ২) ডাল ৩) শাকসবজি ৪) মাছ/মাংস/ডিম।

এছাড়া চাল, ডাল, সবজি (যেমন- মিষ্টিকুমড়া, গাজর, পেঁপে, আলু ইত্যাদি) পরিমাণ মতো তেল ও মসলাসহ খিচুড়ি তৈরি করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। খিচুড়ি তৈরির সময় যে পরিমাণ চাল দেয়া হবে তার অর্ধেক পরিমাণ ডাল দিতে হবে। শিশুকে মুরগির কলিজা খেতে দিতে হবে।

- **দুধ ছাড়া নাস্তা :** পিঠা, তেল মাখা মুড়ি, তেল মাখা চিড়া, ফলমূল (পাকা আম, পাকা পেঁপে, কলা ইত্যাদি) বাদাম।
- **দুধসহ নাস্তা :** সেমাই, পায়েস, ফিরনি, ক্ষীর, পুডিং, হালুয়া, ছানা।
- **অসুস্থতার সময় :** এ সময়ে শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ ও বেশি পরিমাণে তরল খাবার খাওয়াতে হবে। শিশুর পছন্দের সুষম খাবার দিতে হবে এবং অল্প অল্প করে শিশুকে বার বার খেতে দিতে হবে। অসুখ থেকে সেরে উঠলে আগের ওজন না হওয়া পর্যন্ত অন্তত ২ সপ্তাহ বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে দিতে হবে।

অরুচির কারণ :

'আমার বাচ্চা খেতে চায় না' এমন কথা মায়েদের মুখে প্রায়শই শোনা যায়। সাধারণত যেসব কারণে শিশু খেতে চায় না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জোরপূর্বক খাওয়ানো, শক্ত খাবার, অপছন্দের খাবার এবং একই খাবারের পুনরাবৃত্তি। শিশুকে জোরপূর্বক খাওয়ানো শিশু নির্যাতনের শামিল। এতে একদিকে যেমন শিশুর ওজন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে শিশু অতিরিক্ত ওজন লাভ করতে পারে, যা তার জন্য ক্ষতিকর। জোর করে খাওয়ালে খাবারের প্রতি শিশুর অনীহা তৈরি হয় এবং সে খাবার দেখলে ভয় পায় বা বমি করে।

শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে-

১। যত্নের সাথে শিশুর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
২। শিশুর যখন ক্ষুধা লাগবে, তখন খাওয়াতে হবে।
৩। জোর করে খাওয়ানো যাবে না- খাবারের প্রতি শিশুর আগ্রহ তৈরি করতে হবে।
৪। পরিবারের অন্যান্যদের সাথে শিশুকে আলাদা প্লেটে খেতে দিতে হবে এবং তাকে নিজে নিজে খেতে উৎসাহ দিতে হবে।
৫। বাড়ির তৈরি করা খাবারে শিশুকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।
৬। খাবারের পূর্বে শিশুকে পানি, জুস, চকোলেট ইত্যাদি দেয়া যাবে না।
৭। টেলিভিশন দেখিয়ে বা কার্টুন দেখিয়ে শিশুকে খাওয়ানো যাবে না। খাবারের প্রতি শিশুকে মনোযোগী করে তুলতে হবে।
৮। শিশুকে বিভিন্ন ধরণের খাবার দিতে হবে, একই খাবার বার বার না খাইয়ে খাবারে বৈচিত্র্য আনতে হবে।
৯। শিশুকে তার প্রতিবার শেষ করা খাবারের জন্য অভিনন্দন জানাতে হবে।
১০। মায়ের হাসিভরা মুখ আর উৎসাহ শিশুর পুষ্টি পূরণে সহায়ক।
১১। শিশু খাবার গ্রহণের আগে ঠিকমত হাত ধুয়ে নিচ্ছে কি না তা খেয়াল রাখতে হবে।

ডা. ইউ কে এম নাজমুন আরা
এমবিবিএস, এফসিপিএস (শিশু)
শিশু বিশেষজ্ঞ, আবাসিক চিকিৎসক (শিশু)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

আপনার গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার বাতি/এসি/ কিংবা ফ্যান প্রয়োজন ছাড়া চালিয়ে রাখবেন না।

আপনার গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার অতিরিক্ত বাতি কিংবা ফ্যান চালিয়ে রাখবেন না। যদি দু'একটা বাতি নিভিয়ে রাখলেও আপনার কাজের অসুবিধে না হয়, তবে একটা কিংবা দু'টো বাতি নিভিয়ে রাখুন। আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন একটি বাতি, এসি কিংবা ফ্যানে যতোটুকু বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, এরকম হাজার, লক্ষ গৃহের, কর্মস্থলের, কারখানার প্রয়োজন ছাড়া কিংবা অতিরিক্ত বাতি/এসি কিংবা ফ্যান চালিয়ে না রাখলে লক্ষ লক্ষ ওয়াট সাশ্রয় হবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয় একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করবে, অপর দিকে এই সাশ্রয়ী অর্থ দেশের উন্নয়নে এক বিশাল অবদান রাখবে।

জনস্বার্থে –

হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা জরুরি

বিশ্বব্যাপী শিশুর বৃদ্ধির সচেতনতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পালিত হয়। আমাদের দেশেও ইদানিং বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কিছু জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে। উল্লেখ্য, শিশুর বৃদ্ধির সচেতনতায় প্রতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় 'গ্রোথ এ্যাওয়ারনেস ডে'।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (নিপোর্ট) তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৮ শতাংশ ছেলে-মেয়ে দৈহিক বৃদ্ধির ঘাটতিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হলে প্রকৃত অবস্থা জানা যেতে পারে। পৃথিবীব্যাপী বাড়ন্ত শিশুর বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দৃশ্যমান। বিশ্বব্যাপী এ সংখ্যা প্রায় ২.৫ শতাংশ।

বৃদ্ধিজনিত সমস্যাগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। তবে শিশুর বিশেষ বয়সের সাথে তার বৃদ্ধি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে তার বৃদ্ধিজনিত ঘাটতি রয়েছে ধরে নেওয়া হয়।

কারণগুলো ঃ

* দীর্ঘস্থায়ী রোগ (জেনেটিক ত্রুটিসহ)
* বংশগত বৃদ্ধি ঘাটতি
* হরমোনজনিত সমস্যার কারণে বৃদ্ধি ঘাটতি

দীর্ঘস্থায়ী রোগজনিত বৃদ্ধি সমস্যা ঃ

যে সব শিশু খুব ছোটবেলা থেকে দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হয় যেমন- যক্ষ্মা, হাঁপানি, ম্যাল অ্যাবসোরপশন (Malabsorption) সিনড্রোম বা খাদ্য শোষণ ও পরিপাকজনিত সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস সিনড্রোম ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে তাদের বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হয় না। আবার যাদের ছোটবেলা থেকে রোগের কারণে পুষ্টির ঘাটতি হয় তাদেরও বৃদ্ধি সঠিক হবে না।

জিন ও ক্রোমোজোম ত্রুটিজনিত সমস্যাসমূহের মধ্যে ডাউন সিনড্রোম, টার্নার সিনড্রোম প্রধানত চোখে পড়ে। তবে আরও কিছু সমস্যা আছে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস নামক জিনগত ত্রুটি শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে, যা বৃদ্ধি ব্যাহত করে থাকে।

বংশগত বৃদ্ধি ঘাটতি ঃ

পরিবারের শিশুর বৃদ্ধি কাঙ্খিত হারে হচ্ছে না এমন অভিযোগ নিয়ে যে সব অভিভাবক আসেন সে সব শিশুর সকলেরই যে বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে না তা নাও হতে পারে। কারণ একেকজনের দৈহিক বৃদ্ধির হার বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম থাকে। আমাদের কাছে যখন শিশুর অভিভাবকরা তার ছেলে-মেয়ের অসন্তোষজনক বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে আসেন তখন আমরা তার পরিবারে অন্য সদস্যদের বৃদ্ধির হার দেখার সাথে সাথে তার সমবয়সীদের সাপেক্ষে বৃদ্ধি বেশি-কম সেটাও দেখার চেষ্টা করি। যেমন দেখা হয়, বৃদ্ধির হার কি সাম্প্রতিককালে কমেছে না বরাবরই কম ছিল? তারপর শিশুর বৃদ্ধির ঘাটতিজনিত সমস্যা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার শারীরিক গঠন, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত ইতিহাস, দীর্ঘসূত্রি রোগের ইতিহাস নেওয়া হয়। কারও কারও পরিবারের সদস্যদের প্রায় সবারই বৃদ্ধির ধীরগতি থাকে, আবার কারও সাময়িক বামনত্ব মনে হলেও তার শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত দৈহিক বৃদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

যাদের কোনো রোগ আছে তাদের সেগুলো নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যাদের জেনেটিক ত্রুটি আছে তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসাটা বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল হয়।

হরমোনজনিত সমস্যা ঃ

আবার হরমোনজনিত বেশকিছু কারণ বৃদ্ধি ঘাটতির জন্য দায়ী। গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি স্পষ্টতই বৃদ্ধি ঘাটতির কারণ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যে কোনো সময় ঘাটতি শুরু হওয়ার পর পরই বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। কম বয়সীদের ক্ষেত্রে যদি গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি থাকে তা শনাক্ত করে চিকিৎসা করতে পারলে ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক।

গ্রোথ হরমোন ঘাটতিজনিত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, চিকিৎসা ও ফলোআপ বাংলাদেশে হরমোন বিশেষজ্ঞ (এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট) দক্ষতার সাথে করে আসছেন। কিন্তু গ্রোথ হরমোনের ঘাটতি থাকলে চিকিৎসা কিছুটা ব্যয়বহুল হয়। আবার টার্নার সিনড্রোম রোগীদেরও গ্রোথ হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়।

গ্রোথ হরমোন ঘাটতি থাকলে প্রাপ্ত বয়সেও তার গ্রোথ হরমোন ইনজেকশন নিতে হতে পারে। এ রকম একজন বিখ্যাত লোক হলেন- লিওলেন মেসি, যিনি ১৬ বছর বয়সে বার্সেলোনায় এসে গ্রোথ হরমোন ঘাটতির চিকিৎসা নেন। যাদের পুষ্টিহীনতার কারণে বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে না তাদের অল্প বয়সে পুষ্টির সংশোধন হলে বৃদ্ধির উন্নতি হতে পারে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়সে সংশোধন হলেও লাভ নেই। অল্প বয়সে শনাক্ত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়।

কিন্তু বাংলাদেশের মতো আয়োডিন ঘাটতি এলাকার মানুষের জনবসতিতে ছেলে-মেয়েদের বৃদ্ধি ঘাটতি অন্যতম কারণ হল থাইরয়েড হরমোনের স্বল্পতা (হাইপোথাইরয়েডিজম)।

হাইপোথাইরয়েডিজমে শারীরিক বৃদ্ধির সাথে মানসিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। পৃথিবীর সকল উন্নত দেশ তাদের সন্তানদের জন্মের পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা জেনে নেয়। কেননা, মেধাবী জাতি পেতে হলে অতি অল্প বয়স থেকেই শরীরে থাইরয়েড হরমোনের আদর্শ মাত্রা থাকা উচিৎ। এ দেশের খাটো মানুষদের অনেকেই ছোটবেলা থেকে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতিতে আক্রান্ত ছিল। আর দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা করলে তাদের স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করা যেতো। একই সাথে মেধারও বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারতো।

তাই অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন পরিবারের নতুন সদস্যদের বৃদ্ধির প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখবেন। সন্দেহ হওয়া মাত্র শিশু বিশেষজ্ঞ/অনেক ক্ষেত্রে হরমোন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হবেন। তাতে অনেক সংশোধনযোগ্য বৃদ্ধি ঘাটতি সমস্যা তড়িৎ সমাধান করে ছেলে-মেয়েদের দৈহিক স্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ অর্জন করা যেতে পারে।

ডাঃ রোখসানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক (ফিজিওলজী)
বিক্রমপুর ভূইয়া মেডিকেল কলেজ

শিশুদের রক্তশূন্যতা

রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া (Anemia) বলতে রক্তে হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ বা লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বয়স, লিঙ্গ, জাতি বা বর্ণ ভেদে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে যাওয়াকে বুঝায়।

শিশুদের বয়স ভেদে নরমাল হিমোগ্লোবিনের পরিমাণঃ

বয়স (বছর)	হিমোগ্লোবিন (গ্রাম/ডেসিলিটার)
নবজাতক	১৩ - ২০
০.৫ - ১.৯(৬ মাস -২ বছর)	১২.৫
২ - ৪	১২.৫
৫ - ৭	১৩.০
৮ - ১১	১৩.৫
১২ - ১৪ (মেয়ে)	১৩.৫
১২ - ১৪ (ছেলে)	১৪.০
১৫ - ১৭ (মেয়ে)	১৪.০
১৫ - ১৭ (ছেলে)	১৫.০
১৮ (মেয়ে)	১৪.০
১৮ (ছেলে)	১৬.০

অ্যানিমিয়ার কারণসমূহঃ

পুষ্টিহীনতা ঃ-
- আয়রনের অভাব
- ফলিক এসিড ও ভিটামিন বি-১২ এর অভাব
- প্রোটিন - শক্তি অপুষ্টি

জেনেটিক কারণ ঃ-
- থ্যালাসেমিয়া
- হিমোগ্লোবিন ভ্যারিয়েন্ট
- G6PD এনজাইম ঘাটতি

সংক্রামক কারণসমূহ ঃ-
- হেলমিন্থিয়াসিস
- ম্যালেরিয়া
- কালাজ্বর

অন্যান্য কারণসমূহঃ

* অ্যাকিউট লিউকেমিয়া
* অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া(Aplastic Anemia)
* দীর্ঘস্থায়ী রোগজনিত অ্যানিমিয়াঃ দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ, দীর্ঘস্থায়ী যকৃতের রোগ।
* আয়রনের অভাবে অপর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন উৎপাদন শিশু কিশোরদের রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ।
* সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় ৩০% মানুষ আয়রনের অভাবজনিত কারণে অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হয়।

প্রতিদিন দেহের আয়রনের চাহিদাঃ ৮-১০ মিলিগ্রাম

শিশুদের আয়রনের অভাবজনিত কারণে অ্যানিমিয়া কারণ, উপসর্গ ও প্রতিকার

আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার কারণসমূহ

১। পুষ্টিজনিত অভাবঃ
   * অপর্যাপ্ত পুষ্টি
   * দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত গরুর দুধ পান
   * খাবারে আয়রনের ঘাটতি

২। অতিরিক্ত চাহিদাঃ
   * প্রিমেচিউর বেবি বা পূর্ণ গর্ভধারণের যথাযথ সময়ের পূর্বেই জন্মগ্রহণকারী নবজাতক
   * স্বল্প ওজনের নবজাতক (<২.৫ কেজি)
   * কিশোর-কিশোরীদের বাড়ন্ত বয়স

৩। খাদ্য পরিপাকে সমস্যাঃ
   * খাদ্য শোষণজনিত সমস্যা বা ম্যালঅ্যাবসোরপশন
   * আইবিডি বা ইনফ্ল্যামেটরি বাউয়েল ডিজিজ
   * দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া

৪। অতিরিক্ত ক্ষয়ঃ
   » প্রসবকালীন সময়েঃ
   * নাভিরজ্জু ঠিকমত না বাঁধা
   * প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বা প্রসবের পূর্বেই অ্যামনিয়োটিক রস বের হওয়া
   * গর্ভফুল প্রসবের পূর্বেই জরায়ু হতে আলাদা হয়ে যাওয়া

   » প্রসব পরবর্তীকালীন সমস্যাঃ
   * গরুর দুধ হজমে সমস্যা হলে
   * হুক ওয়ার্ম সংক্রমণ
   * অন্ত্রে আলসার বা ক্ষত, পাইলস ইত্যাদির কারণে রক্তক্ষরণ
   * গ্যাস্ট্রাইটিস

শিশুদের আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার লক্ষণসমূহ

* ফ্যাকাসে ভাব
* ক্লান্তি
* খিটখিটে মেজাজ
* অরুচি
* ওজন হ্রাস
* বুক ধড়ফড়ানি
* মনোযোগে ঘাটতি
* ঠোঁটের কিনারায় ঘা
* স্নায়ুদুর্বলতা
* বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস
* ময়লা খাবার বা অখাদ্য জিনিসের প্রতি আকর্ষণ, যাকে 'পিকা' বলে।

পুষ্টি পরামর্শ

* প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ পান
* প্রিটার্ম স্বল্প ওজনের বাচ্চাদেরকে জন্মের পর ৩য় সপ্তাহ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে।
* ৬ মাস পর থেকে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে।
* কৃমির ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শমত সেবন করাতে হবে।

মুখে যে ওষুধের মাধ্যমে আয়রনের অভাব পূরণ করা যায়

* মূল উপাদানঃ ফেরাস সালফেট
* ফর্মুলেশনঃ ক্যাপসুল বা সিরাপ হিসেবে পাওয়া যায়।
* ডোজঃ ৩-৬ মিগ্রা/কেজি/দিন, মোট দিনে ৩ বার
* চিকিৎসার ব্যাপ্তিকালঃ
  - কমপক্ষে ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত ঃ রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কণিকার পরিমাণ স্বাভাবিকে আসা পর্যন্ত।
  - সাধারণত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকে আসতে ৮-১২ সপ্তাহ সময় লাগে।
  - তাই সাধারণত ৩-৪ মাস আয়রন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দেয়া হয়।

আয়রন ঔষধ সেবনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহঃ

* নস্যি
* পেটে ব্যথা
* মুখে বিস্বাদ লাগা
* কোষ্ঠকাঠিন্য

চিকিৎসা

* পুষ্টি পরামর্শ
* আয়রনের অভাব পরিপূরণঃ
  - মুখে ওষুধের মাধ্যমে বা
  - শিরাপথে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে
* রক্ত সঞ্চালন

শিরাপথে আয়রন রিপ্লেসমেন্টের নির্দেশিকাঃ

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আয়রন ঔষধ শিরাপথে দিতে হয়ঃ

* যখন মুখে সেবনে কাজ হয় না।
* আয়রন পরিশোষণে ব্যাঘাত ঘটা, সাধারণত ক্ষুদ্রান্ত্রে রোগ থাকলে এরকম হয়।
* পাকস্থলি, অন্ত্রে কোন রোগের কারণে রক্তক্ষরণ হওয়া।

রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করানো দরকার

* রক্ত পরীক্ষা ঃ সিবিসি (হিমোগ্লোবিন সহ)
* রক্তের আয়রন প্রোফাইল
* মল পরীক্ষা ঃ রক্তকণিকা দেখার জন্য। একে বলে 'অকাল্ট ব্লাড টেস্ট'

রক্তশূন্যতা দূর করার উপায়

আয়রন থেরাপির পর দেহে প্রতিক্রিয়া

আয়রন দেয়ার পর সময়	শারীরিক প্রতিক্রিয়া
১২-১৪ ঘন্টা	কোষের আভ্যন্তরীন আয়রন পুনরুদ্ধার, শারীরিক অবস্থার একটু উন্নতি
৩৬-৪৮ ঘন্টা	অস্থি মজ্জা তে যায় এবং হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে অংশ নেয়
৪৮-৭২ ঘন্টা	রেটিকুলোসাইটোসিস
৪-৩০ দিন	হিমোগ্লোবিন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়
১-৩ মাস	পর্যাপ্ত আয়রন শরীরে মজুদ হয়

নিউট্রিশনাল অ্যানিমিয়া প্রতিরোধের উপায়

* জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ পান (Exclusive Breastfeeding) এবং ৬ মাস বয়স থেকে সম্পূরক খাদ্য নিশ্চিতকরণ।
* খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, যাতে করে উন্নত ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে।
* আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
* কৃমির ঔষধ সেবন
* নিরাপদ পানি পান, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

ডাঃ আজমেরী আলম
সহযোগী অধ্যাপক (বায়োকেমিস্ট্রি)
গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

মূত্রনালীর সংক্রমণ: লক্ষণ ও চিকিৎসা

মূত্রনালীর সংক্রমণ আমাদের দেশে অতি সাধারণ জীবাণুবাহিত রোগ। প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া নিয়ে অনেককেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। এই রোগের আক্রমণ ২০ বছর বয়সীদের মধ্যে ৩% দেখা যায়, প্রতি ১০ বছর বয়সীদের (decade) মাঝে ১% হারে সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বয়স বৃদ্ধির সাথে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মাঝে এই রোগের প্রবণতা কম। তবে ৬০ বছরের বয়স্ক পুরুষ, প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধির ফলে, মূত্রনালী কোন কিছু দ্বারা বাধাগ্রস্থ হলে- মূত্রনালী সংক্রমণ হতে পারে। এমনকি মূত্রনালী সংক্রমণের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিডনীর কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মূত্রনালী সংক্রমণের কারণ : কিছু কিছু জীবাণু এই সংক্রমণের জন্য দায়ী। সেগুলো হল-

ক) E. Coli - অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।
খ) অন্যান্য জীবাণুর মধ্যে Pseudomonas, Proteus, Streptococci, Staphylococcus epidermidis.
গ) হাসপাতালে সংক্রমণের অধিকাংশ কারণই হয় E. Coli এর মাধ্যমে।
ঘ) মূত্রনালীতে ক্যাথেটার ব্যবহার।

যাদের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ঃ

পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে মূত্র সংক্রমণের প্রকোপ বেশি। কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১) মূত্রনালীর আকার ছোট।
২) সহবাসের সময় মূত্রনালীতে আঘাত।
৩) পায়ুপথ ও মূত্রনালীর কাছাকাছি অবস্থান।
৪) পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট গ্রন্থি নিঃসৃত এক ধরণের তরল পদার্থ (Prostatic fluid) ব্যাকটেরিয়াকে বিনষ্ট করে- যা মহিলাদের ক্ষেত্রে নেই।
৫) মূত্রনালীতে পাথর।
৬) ডায়াবেটিস রোগী।
৭) বাচ্চাদের জন্মগত ভাবে মুত্রনালীতে অতিরিক্ত পর্দা (posterior urethral valve) থাকলে বার বার প্রস্রাবে ইনফেকশন হয়।

উপসর্গ/লক্ষণঃ

(ক) প্রস্রাব ঘন ঘন হওয়া
(খ) প্রস্রাবের সময় মূত্রনালীতে জ্বালাপোড়া
(গ) পেটের নিচের অংশে ব্যথা অনুভূত হওয়া
(ঘ) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ও ঘোলাটে হওয়া
(ঙ) এমনকি প্রস্রাবের সাথে রক্ত পর্যন্ত যেতে পারে
(চ) জ্বর হওয়া (সাধারণত কেঁপে কেঁপে জ্বর আসে)

রোগ নির্ণয়:

মূত্রনালীতে জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে কি না, কিংবা সংক্রমণের পরবর্তী জটিলতা নির্ণয়ের জন্য ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করার প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল-

ক) মূত্রের নমুনা সংগ্রহকরণ ও অণুবীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষাকরণ (Urine for R/E);
খ) মূত্রের কালচার (culture) ও সেনসিটিভিটি (Sensitivity) টেস্ট;
গ) প্লাজমা ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন এর পরিমাণ নির্ণয়;
ঘ) সিবিসি ও ব্লাড কালচার;
ঙ) পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও কিডনি ও মূত্র সংবহনতন্ত্রের (KUB Region) প্লেইন এক্স-রে করা।
জ) সিসটোস্কপি (cystoscopy)- যদি প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণের ইতিহাস থাকে।

চিকিৎসা ঃ

এই রোগে চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের গুরুত্ব অধিক। এ জন্য যা করণীয় তা হল-

১। প্রতিদিন কমপক্ষে ২-৩ লিটার পানি গ্রহণ।
২। স্বামী সহবাসের পূর্বে ও পরে প্রস্রাব করা।
৩। প্রস্রাব আটকায়ে রাখার অভ্যাস ত্যাগ করা।
৪। নিম্নোক্ত ওষুধগুলোর মূত্র সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য দেওয়া যেতে পারে। সিপ্রোফ্লক্সাসিন (ciprofloxacin), ট্রাইমেথোপ্রিম (Trimethoprim) বা কোঅ্যামোক্সিক্লাভ (co-amoxiclav)

ঘাড় ও কোমর ব্যথায় আধুনিক চিকিৎসা

মেরুদন্ড মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ যা ছোট ছোট অনেকগুলো হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। এই ছোট হাড়গুলোর প্রতিটিকে আলাদা আলাদাভাবে কশেরুকা (ভার্টিব্রা) বলা হয়। প্রতি দুটি কশেরুকার মাঝে চাপ শোষণকারী চাকতি (ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক) থাকে- যা গাড়ির স্প্রিং বা শক এবজরবারের মতো কাজ করে। এটি মেরুদন্ডের এক হাড় থেকে অন্য হাড়কে আলাদা রাখে ও নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। এ সব হাড় কিংবা ডিস্কে কোনো ধরণের সমস্যা দেখা দিলে শরীরে বিভিন্ন ধরণের, বিশেষ করে কোমর ও ঘাড়ে ব্যথা দেখা দিতে পারে। নিচে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

ঘাড় ও কোমর ব্যথার কারণ ঃ

* সাধারণত ভারী জিনিস উঠানো, আঘাত, শরীরের বিশেষ অবস্থায় ঝাঁকি খাওয়াসহ বিভিন্ন কারণে ডিস্কের স্থানচ্যুতি (প্রোলাপ্স) ঘটে। এর কারণে সংলগ্ন মেরুরজ্জু (স্পাইনাল কর্ড) অথবা স্নায়ুমূল (নার্ভরুট) অথবা উভয়ের উপরেই চাপ পড়তে পারে। কোমরের (লাম্বার) ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে রোগী কোমর বা মাজায় তীব্র ব্যথা অনুভব করে। ফলে রোগী বসতে বা দাঁড়াতে পারে না।

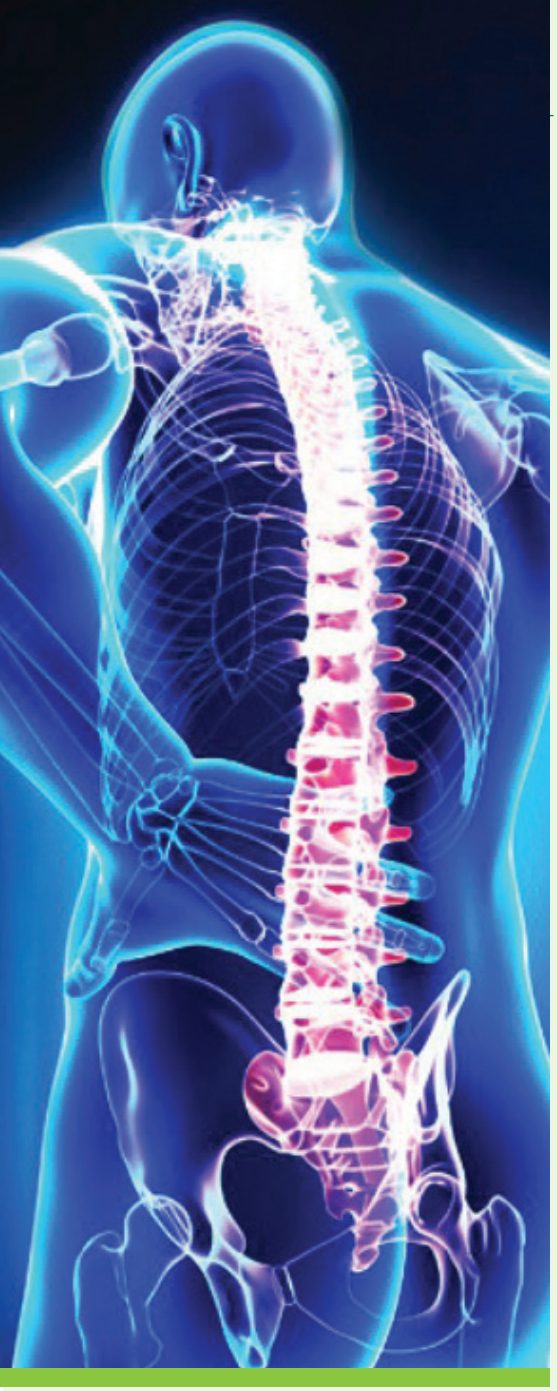

* কোমরে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ (নার্ভ) কোমর থেকে পা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মাজা ব্যথার পাশাপাশি একপাশ বা উভয় পাশের রান, হাঁটু, হাঁটুর নিচের গোছা, গোড়ালি বা পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যে কোন জায়গায় ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এ ছাড়াও শরীরের এসব জায়গায় ঝিন-ঝিন, শিন-শিন করে, পায়ের বোধ শক্তি কমে যায়, পর্যায়ক্রমে পা দুর্বল হয়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে রোগী হাঁটতে, দাঁড়াতে এমনকি বসতেও পারে না।

* অন্যদিকে মানুষের ঘাড়ে (সারভাইকাল) উৎপন্ন স্নায়ুগুলো ঘাড় থেকে হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। কাজেই ঘাড়ের ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে প্রাথমিক পর্যায়ে ঘাড়ের ব্যথার পাশাপাশি ডান বা বাম হাত বা উভয় হাতে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। লাম্বার ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের মত এখানেও হাত ঝিন-ঝিন, শিন-শিন করে, হাতের বোধ শক্তি কমে যায়। এক পর্যায়ে হাত দুর্বল হয়ে যেতে পারে এমনকি হাত-পা উভয়ই দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

* বয়স্ক লোকদের মেরুদন্ডের হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যথা হয়। একে অস্টিওপরোসিস বলে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি হয়। হাড় থেকে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে হাড় নাজুক ও ভঙ্গুর হয়ে যায়, ফলে অল্প চাপেই হাড়ে ফাটল ধরে এবং নড়াচড়ার সময় ব্যথা অনুভূত হয়।

* অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোমর ব্যথার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। হাড়ের জোড়ার বাতকে গেঁটে বাত বলা হয়। এটি এক ধরণের ডিজেনারেটিভ আর্থ্রাইটিস। হাড়ের মধ্যে প্রদাহ বা inflammation এর কারণে বার বার ক্ষয় ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এক সময় অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকা কার্টিলেজ (নরম হাড়) ধ্বংস হয়, অস্থিসন্ধির মধ্যে জোড়া লেগে যায়, মেরুদন্ডের চারপাশে ছোট ছোট কাঁটার ন্যায় হাড় তৈরী হয়। ফলে মেরুদন্ডের জয়েন্টসমূহ শক্ত হয়ে যায় ও জয়েন্টসমূহের মধ্যে নড়াচড়া ব্যাহত হয়।

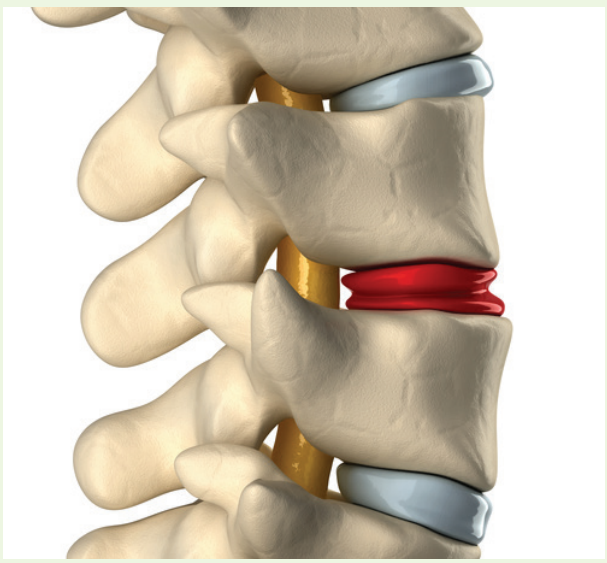

* এছাড়াও বিভিন্ন রোগের কারণে কোমর ব্যথা হতে পারে। যেমন- অ্যাঙ্কাইলোসিং স্পন্ডাইলাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, স্পাইনাল স্টেনোসিস, স্পাইনাল কর্ড টিউমার ইত্যাদি।

ঘাড় ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা ঃ

* নিয়মিত হালকা ব্যায়াম
* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
* রোগ নির্ণয় ও রোগের যথাযথ চিকিৎসা
* ডাক্তারের পরামর্শমত ঔষধ সেবন

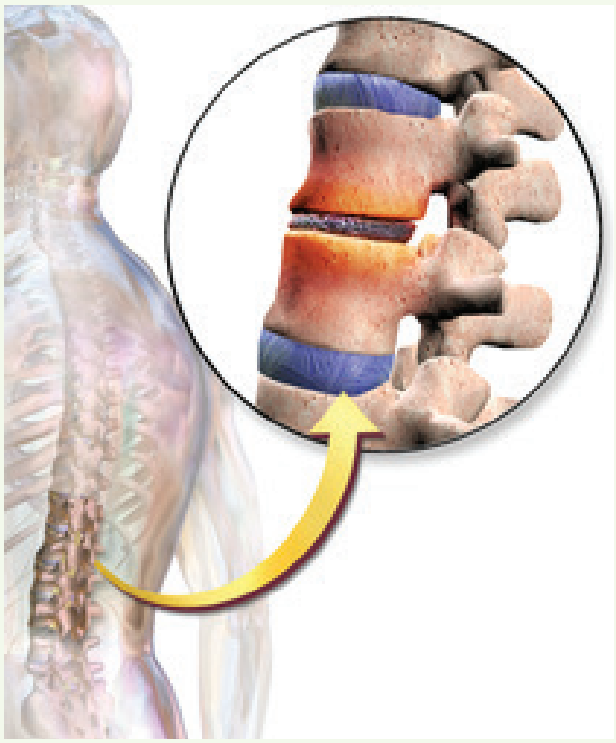

* **লেজার চিকিৎসা ঃ** গবেষণা বা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পারকিউটেনিয়াস লেজার ডিস্ক ডিকম্প্রেশনের (পিএলডিডি) মাধ্যমে নির্দিষ্ট মাত্রার ও নির্দিষ্ট ধরণের লেজার রশ্মি প্রয়োগ করে অতি সহজেই নিউক্লিয়াস পালপোসাসের অংশবিশেষ বাষ্পায়িত করে এর অতিরিক্ত চাপ কমানো সম্ভব। ফলে স্থানচ্যুত (প্রোলাপ্সড) ডিস্ক পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্পাইনাল কর্ড ও নার্ভরুটের উপর থেকে চাপ কমে রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এ ছাড়া লেজারের অপটোথারমো মেকানিক্যাল স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ছিঁড়ে যাওয়া এ্যানিউলাস ফাইব্রোসাস রিপেয়ার বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে হাড়, মাংস ও চামড়া কাটার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি রোগীকে অজ্ঞান করারও প্রয়োজন হয় না। উন্নত বিশ্বে ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের বেশির ভাগ রোগীরই এখন আর কেটে অপারেশন করা হয় না। সারভাইক্যাল/লাম্বার ডিস্ক প্রোলাপ্সের বেশির ভাগ রোগীই পারকিউটেনিয়াস লেজার ডিস্ক ডিকম্প্রেশনের (পিএলডিডি) মাধ্যমে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে থাকে।

* **সার্জারী ।**
* **স্টেম সেল প্রতিস্থাপনঃ** ক্ষয়ে যাওয়া অংশে স্টেম সেল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হাড় পুনরুদ্ধার সম্ভব। এটা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে।

কিডনী কি ও কিছু মৌলিক তথ্যঃ

কিডনী আমাদের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সাধারনত আমাদের শরীরে দুইটি কিডনী থাকে। পেটের পিছনে কোমর থেকে কিছুটা উপরে ও মেরুদন্ডের দুই পাশে এগুলোর অবস্থান। তবে জন্মগত ত্রুটির কারনে কারো কারো একটি কিডনীও থাকতে পারে এবং এটি নিয়ে বাকী জীবন সুস্থ স্বাভাবিক থাকা সম্ভব, যদিও অনেক বৎসর পরে কারো কারো প্রস্রাবে প্রোটিন/অ্যালবুমিন নির্গত হতে পারে এবং কারো কারো উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে। তাই এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। জন্মগত ত্রুটির কারনে কারো কারো কিডনীর অবস্থান ও আকৃতিও ভিন্ন হতে পারে , এতেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই যদিও এদের কারো কারো কোমরে বা তলপেটে ব্যথা হওয়া, প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া বা ইনফেকশন হওয়া বা কিডনীতে পাথর হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন। আরেকটি তথ্য হচ্ছে, কিডনীর স্বাভাবিক সাইজ ৯-১১ সে.মি. যদিও বাম কিডনী ১-১.৫ সে.মি.বড় থাকে। এখানে জেনে রাখা ভালো যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোমর ব্যথা কিডনীর জন্য হয় না বরং কোমরের হাড় গোড়, মাংশপেশী, লিগামেন্ট ও নার্ভ সহ অন্যান্য মেকানিক্যাল কারনেই ব্যথা হয়ে থাকে।

কিডনীর কাজ কি ঃ

প্রতিটি কিডনীতে প্রায় ১০ লক্ষ ছাকনি থাকে যা প্রতিনিয়ত প্রায় ১৭০-২০০ লিটার রক্ত পরিশোধন করে প্রস্রাব তৈরির মাধ্যমে শরীরে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তৈরী বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয় এবং একইভাবে শরীরের তরল ও খনিজ পদার্থের সমতা বজায় আনে। তাছাড়া কিডনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হরমোনও তৈরী করে যেমনঃ হাড় মজবুত রাখার জন্য ভিটামিন ডি,রক্ত তৈরীর জন্য ইরাইথ্রোপয়েটিন ও রক্তচাপ বজায় রাখার হরমোন রেনিন। কিডনী কিছু কিছু কেমিক্যাল পদার্থও নিষ্ক্রিয় করে থাকে তাই কিডনীকে বিস্ময়কর বা এ্যামেজিং কিডনী বলা হয়।

কিডনীর রোগঃ

কিডনীর রোগগুলোকে আমরা সাধারনতঃ দুই ভাগে ভাগ করে থাকি যেমন নেফ্রোলজি বিষয়ক বা মেডিক্যাল ডিজিজ যেমন নেফ্রাইটিস,কিডনী ফেইলিউর, কিডনী/ইউরিন ইনফেকশন ইত্যাদি। অন্যদিকে সার্জিক্যাল বা ইউরোলজি বিষয়ক রোগ যেমন প্রস্টেট এর রোগ, কিডনীর পাথুরে রোগ, কিডনীর টিউমার, ইউরিনারী ট্র্যাক্ট এ ব্লক ইত্যাদি।

কিডনী রোগের লক্ষণঃ

কিডনীর রোগে নানা ধরনের লক্ষণ দেখা যায় , যার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রধানত দেখা যায়:

- সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে চোখ ফুলে যাওয়া।
- মুখ এবং পা ফুলে যাওয়া।
- ক্ষুধামন্দা , বমি ভাব , দুর্বল ভাব।
- বার বার প্রস্রাবের বেগ , বিশেষ করে রাত্রে।
- কম বয়সে উচ্চ রক্তচাপ
- শারীরিক দুর্বল ভাব , ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া।
- অল্প হাঁটার পরে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া বা তাড়াতাড়ি ক্লান্তি অনুভব করা।
- প্রস্রাবে বেশি ফেনা হলে: প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নামক প্রোটিনের উপস্থিতির জন্যই এমন হয়। কিডনির ফিল্টার ড্যামেজ হয়ে গেলে প্রোটিন লিক হয়ে প্রস্রাবের সাথে বাহির হয় বলে প্রস্রাবে ফেনা দেখা দেয়। এটি কিডনী আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ।
- ৬ বছর বয়সের পরেও রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করা।

- প্রস্রাব কম আসা ।
- প্রস্রাব করার সময় জ্বালা অনুভব করা এবং প্রস্রাবে রক্ত বা পুঁজ-এর উপস্থিতি।
- প্রস্রাব করার সময় কষ্ট হওয়া। ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হওয়া।
- পা আর কোমরের যন্ত্রণা।
- মাংসপেশীতে খিঁচুনি হওয়া
- সবসময় শীত বোধ হওয়া

উপরিউক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে কোনও একটি লক্ষণের উপস্থিতি থাকলে কিডনীর রোগের সম্ভাবনা থাকতে পারে ।

কিডনীর পরীক্ষা কাদের করানোর দরকার? কিডনীর রোগের সম্ভাবনা অধিক কখন ?

১. যে ব্যক্তির কিডনীর রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
২. ডায়াবেটিস (মধুমেহ) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।
৩. উচ্চ-রক্তচাপযুক্ত ব্যক্তি (High Blood Pressure)
৪. পরিবারে বংশানুগতিক কিডনী রোগের ইতিহাস।
৫. অনেক দিন ধরে ব্যাথানাশক(Pain Killer Tablets) ঔষধের সেবন।
৬. রেচনতন্ত্রে জন্মগত রোগ ,
৭. প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বৎসরে ১বার নিয়মিত পরীক্ষা করা দরকার।
৮. যে পরিবারে কেহ যদি কিডনী রোগে (CKD) আক্রান্ত হয়েছেন, সে পরিবারে অন্যরাও ঝুঁকিতে থাকেন।
৯. কেহ যদি পূর্ববর্তীতে আকস্মিক কিডনী বিকলতা বা Acute kidney failure রোগে ভুগেছেন তিনিও ভবিষ্যতে কিডনী রোগের ঝুঁকিতে থাকেন।

কিডনীর রোগের নির্ণয়ের জন্য আবশ্যক পরীক্ষাগুলি হলো ঃ

প্রস্রাবের পরীক্ষা ঃ কিডনী রোগের নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রস্রাব পরীক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। প্রস্রাবে পুঁজের (Pus) উপস্থিতি মূত্রনালীতে সংক্রমণের নিদর্শক। প্রস্রাবের প্রোটিন বা রক্তকণিকার উপস্থিতি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস(Glomerulonephritis) এর নিদর্শক। মাইক্রোঅ্যালবুমিনেমিয়া প্রস্রাবের এই পরীক্ষাটি ডায়াবেটিসের কারণে কিডনী আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তাই সর্ব প্রথম এবং সব থেকে তাড়াতাড়ি এটি নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি।

প্রস্রাবের অন্য পরীক্ষাগুলি হল ঃ

(১) প্রস্রাবে টি.বি.র জীবাণুর পরীক্ষা টি.বি. নির্ণয়ের জন্য।
(২) ২৪ ঘণ্টার মূত্রে প্রোটিনের মাত্রা (কিডনীর ফোলাভাব আর তার চিকিৎসার প্রভাব জানার জন্য)
(৩) প্রস্রাব কালচার আর সেনসিটিভিটি পরীক্ষা (প্রস্রাব সংক্রমণের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া বিষয়ে জানতে আর তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যাপারে জানতে)

রক্তের পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ

১. রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতি (অ্যানিমিয়া) কিডনি ফেল হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
২. রক্তে ক্রিয়েটিনিন এবং ইউরিয়ার মাত্রা এই পরীক্ষা কিডনীর কার্যদক্ষতার পরীক্ষা। ক্রিয়েটিনিন আর ইউরিয়া হল শরীরের অনাবশ্যক বর্জ্য পদার্থ, কিডনীর দ্বারা শরীরের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া। শরীরের ক্রিয়েটিনিন এর সাধারণ মাত্রা ০.৬ থেকে ১.৪ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার আর ইউরিয়ার সাধারণ মাত্রা ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার। কিডনী বিকল হলে দু'টিরই মাত্রা বাড়ে। এই পরীক্ষাটিও কিডনি রোগের নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা ঃ

কিডনির বিভিন্ন রোগের নির্ণয়ের জন্য রক্তের অন্যান্য পরীক্ষাগুলি হল কোলেস্টেরল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফেট ইত্যাদি।
কিডনির সোনোগ্রাফি, ক্ষেএ বিশেষ কিডনি বায়োপসিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই।

Chronic Kidney Disease (CKD)/ দীর্ঘমেয়াদী কিডনী রোগঃ

পাঁচটি ধাপে কিডনী বিকলের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম চারটি ধাপ পর্যন্ত চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় অথবা যে গতিতে কিডনী ক্ষয় হচ্ছে তা অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু একবার পাঁচ নম্বর ধাপে চলে গেলে তখন বেঁচে থাকার উপায় হলো

ডায়ালাইসিস অথবা কৃত্রিম কিডনি সংযোজন/(Kidney Transplant) । এসব পদ্ধতি এতটাই ব্যয়বহুল, আমাদের দেশের শতকরা ১০ ভাগ লোকের পক্ষে এ ধরণের চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই ঘাতক ব্যাধি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো কিডনী বিকলতা প্রতিরোধ করা। জেনে রাখা ভালো একজন ব্যক্তির ৫০% কিডনী কাজ না করলেই রক্তের ক্রিয়েটিনিন বাড়ে, অন্যদিকে ৮০% অকেজো হওয়ার পর রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং CKD এর ভয়াবহতা যে কত মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি মানুষ কোন না কোনভাবে কিডনীজনিত রোগে আক্রান্ত। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, প্রায় ৫০ লাখ শিশুই নানাবিধ কিডনী সংক্রান্ত রোগে ভুগছে। প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার লোক দ্রুতগতিতে কিডনী বিকলতায় মারা যায়। সারা বিশ্বে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ বেঁচে যাচ্ছে ডায়ালাইসিস এবং কিডনী প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে।

- মনে রাখবেন, CKD রোগ হলে তা ধীর গতিতে এগুবে। কখনোই সম্পূর্ন ভালো হয়ে যাবে না। চিকিৎসার মাধ্যমে শুধুমাত্র রোগের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করা যেতে পারে। এক পর্যায়ে কারো কারো ডায়ালাইসিস বা কিডনীট্রান্সপ্ল্যান্ট এর প্রয়োজন হবে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে উপরের নিয়ম মেনে চলা ও নিয়মিত ঔষধ সেবন করা, মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ঔষধ এডজাস্ট করে চললে ভাল থাকা সম্ভব।

- সময়মত (CKD stage 4 এর শেষ ভাগে বা CKD stage ৫ এর প্রথম দিকে) হেমোডায়ালাইসিস এর প্রস্তুতি অপারেশন "ফিস্টুলা" করানো প্রয়োজন। এটি সাধারনতঃ বাম হাতে করা হয়ে থাকে, তাই সে সময় বাম হাতে ইনজেকশান /রক্ত দেওয়া বা নেওয়া ঠিক নয়। একইসাথে ফিস্টুলা করার পূর্বে রোগীর রক্তনালীর এবং হার্টের অবস্থা জেনে নিতে হবে, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীর, কারন ফিস্টুলা করার পরে হার্টের অবস্থা খারাপ হতে পারে বা ফিস্টুলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমনকি শ্বাসকষ্ট হতে পারে।
- এ ধরণের রোগীদের CAPD/পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস করাই শ্রেয়। এটা রোগীর জন্য আরো অনেক সুবিধাজনক।
- সবচেয়ে ভালো হলো কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট/প্রতিস্থাপন করা। মনে রাখবেন, এতে রোগীর জীবন যাপনের মান অনেক ভাল থাকে এবং গড় খরচও কম। আমাদের দেশে বহু আগে থেকেই আর্ন্তজাতিক মানের কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্ট/প্রতিস্থাপন হয়ে থাকে। তবে নিকট আত্মীয়ের যেমন রোগীর বাবা,মা,ভাই, বোন, প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, আপন মামা ,চাচা,খালা,ফুফু বা স্বামী,স্ত্রী-রাই কেবল কিডনী দান করতে পারেন। তাছাড়া আই সি ইউ-তে ব্রেইন ডেথ ঘোষনাকৃত মৃত ব্যাক্তিরাও কিডনী দাতা হতে পারেন। এক্ষেত্রে মৃত ব্যাক্তি আগে থেকেই উইল করে যেতে পারেন অথবা মারা যাবার পর নিকটতম লোকজন অনুমতি দিতে পারেন। এতে আইনগত/ধর্মীয় বাধা নেই।

কিডনী রোগ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ

- ধূমপান ,অতিরিক্ত মদ্যপান ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহন করবেন না।
- ব্যথা নাশক বড়ি, এন্টিবায়োটিক, হারবাল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হবেন।
- সময়মত হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া,ইনফ্লুয়েন্জা-এর টিকা দিবেন।
- শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া, ডিহাইড্রেশন, পুড়ে যাওয়া, খোঁসপাঁচড়া, টনসিলের প্রদাহ, রক্তক্ষরন থেকে আকস্মিক কিডনী বিকল হতে পারে। তাই দ্রুত এগুলোর চিকিৎসা করবেন।
- প্রসাবের প্রদাহ/ইনফেকশনের দ্রুত চিকিৎসা করুন। প্রতিদিন ২-৩ লিটার পানি/তরল পান করুন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এর বেশি পানি/তরল পান করার প্রয়োজন নেই।
- উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কারন এ দুটি রোগের অন্যতম প্রধান টার্গেট কিডনী। ৬-১২ মাস পর পর প্রস্রাবের অ্যালবুমিন ও রক্তের ক্রিয়েটিনিন টেস্ট করুন-বিশেষ করে যে পরিবারে অন্য কেহ কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মনে রাখবেন, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নির্গত হলে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। কারন এতে ধীরে ধীরে কিডনী ক্ষতিগ্রস্থ বা CKD রোগ হওয়ার সম্ভবনা বেশী। তবে প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় হলে, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োগ করে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- প্রস্রাবের রাস্তায় বাধা গ্রস্থতা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করবেন-পুরুষদের প্রোস্টেট, মহিলাদের জরায়ুর সমস্যার কারনে এটি হতে পারে।
- নিয়মিত ৩০ মিনিট দ্রুত হাটবেন। অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রনে রাখুন। ওবেসিটি বা স্থূলতা পরিহার করুন কারণ এতে কিডনী রোগেরও ঝুঁকি বাড়ে।
- গর্ভ/প্রসবকালীন কিডনী জটিলতায় কেউ কেউ আক্রান্ত হতে পারেন, এতে মৃত্যুর/CKD হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি, তাই আগে থেকেই প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞের পরামর্শে থাকা আবশ্যক।
- দূর্ঘটনা জনিত রক্তক্ষরনে দ্রুত ব্যবস্থা নিন, এতে কিডনী আকস্মিক ভাবে বিকল হতে পারে।
- কিডনীর পাথুরে রোগ একবার হলে কয়েক বৎসর পর কারো কারো এটি আবারো হতে পারে, এতে বার বার ইউরিন ইনফেকশন এমনকি CKD রোগও হতে পারে। তাই কমপক্ষে দুই থেকে আড়াই লিটার পানি/তরল পান করা, এনিমেল প্রোটিন , লবন ,ক্যালসিয়াম, কিছু কিছু এন্টাসিড,ভিটামিন ডি ও সি বেশি না খাওয়া, ইউরিন ইনফেকশন এর যথাযথ চিকিৎসা করা, বেশি বেশি টক ফল, গাজর, পালং শাক, কলিজা, মগজ, মাছের ডিম, চকোলেট না খাওয়া,- কিডনীর পাথুরে রোগ প্রতিরোধের সহায়ক।
- মনে রাখবেন, যে সকল টেস্ট করানোর জন্য ডাই /dye বা রং দিতে হয় , যেমন আই ভি ইউ, এনজিওগ্রাম- এতে সাময়িকভাবে কিডনী আক্রান্ত হতে পারে। কেহ যদি কিডনীর জন্মগত রোগ বা ত্রুটিতে ভুগেন, তিনি যে কোন সময় কিডনীর কোন না কোন উপসর্গে ভুগতে পারেন। যদি কোন পরিবারে কেহ কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সে পরিবারের অন্য সদস্যরাও কিডনী রোগের ঝুঁকিতে থাকেন। অথবা কেহ যদি আকস্মিক কিডনী বিকলতা (AKI) রোগে আক্রান্ত হন, তিনি পরবর্তীতেও কিডনী রোগের ঝুঁকিতে থাকেন। তবে এ বিষয়গুলোতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই, বরং সচেতনতা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।
- যাই হোক, কিডনী বিকল রোগীরা আতঙ্কিত না হয়ে বা মানসিক ভাবে ভেঙ্গে না পড়ে সময় মত আস্থার সাথে চিকিৎসা করলে এবং প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে চললে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল থাকা সম্ভব হতে পারে। সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এ রোগের চিকিৎসা এ দেশেই সম্ভব, তাই শুধু শুধু বিদেশে গিয়ে অর্থ খরচ করা বা দেশের সম্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ না করাই শ্রেয়।

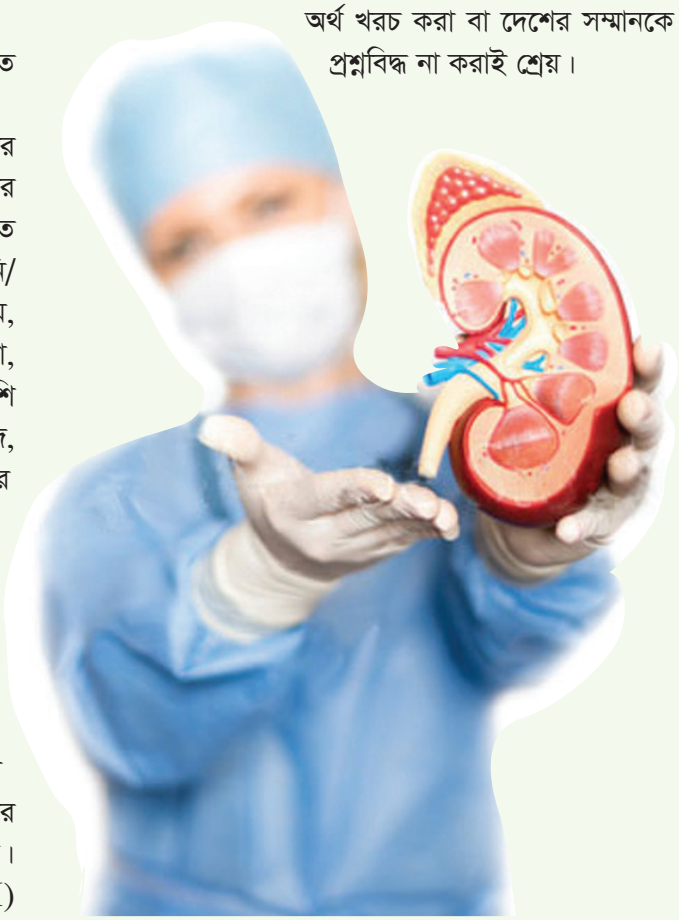

অধ্যাপক ডা. মো. নিজামউদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান,
কিডনী বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ ঃ এক নীরব ঘাতক

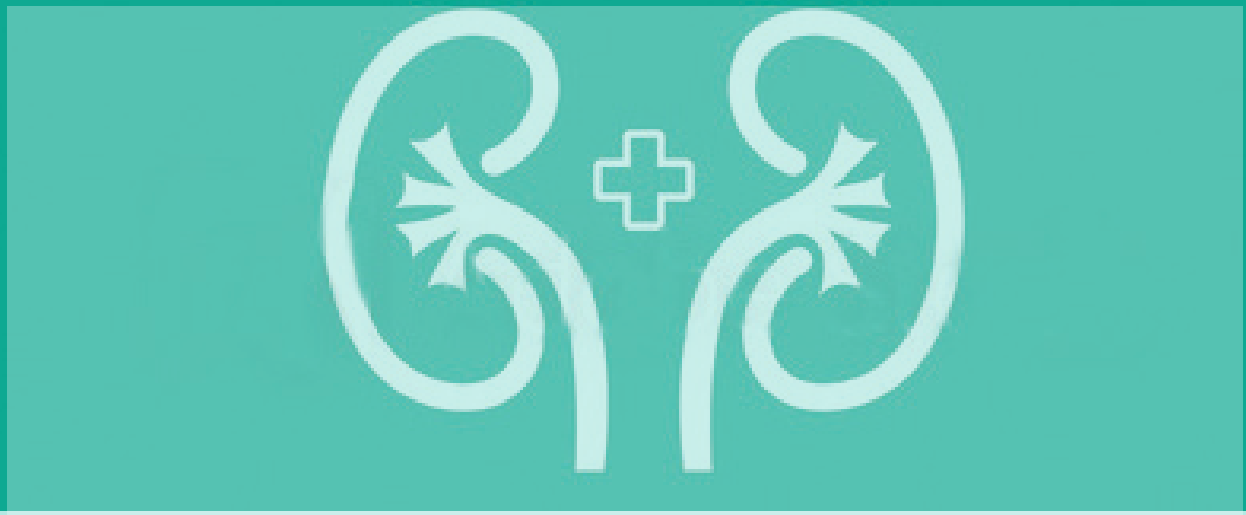

বর্তমানে আমাদের দেশে ক্রনিক কিডনী ডিজিজ বা দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। প্রায় সব পরিবারের কোন না কোন সদস্য এই রোগে আক্রান্ত। তাই এই মরণঘাতী রোগ সম্পর্কে আমাদের সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ বলতে কিডনী ধীরে ধীরে (কয়েক মাস বা বছর ধরে) অকেজো হওয়া বা এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে বুঝায়। মানবদেহে প্রতিটি বৃক্কে রয়েছে প্রায় ১মিলিয়নের মত নেফ্রন, যা বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যকর একক। যদি কোন নেফ্রন ক্ষতি গ্রস্থ হয়, তবে সেটি স্বাভাবিক কাজ করতে পারেনা। তখন অন্যান্য সুস্থ নেফ্রন গুলো স্বাভাবিক কার্যাবলী ঠিক রাখার জন্য অতিরিক্ত কাজ করে। এভাবে আরো অনেক নেফ্রন নষ্ট হয় অতিরিক্ত কাজ করতে করতে এবং এই সংখ্যা বাড়তেই থাকে। শেষ পর্যন্ত আর পর্যাপ্ত কার্যকরী নেফ্রন থাকেনা, ফলে বৃক্ক অকেজো হয়ে পড়ে।

শরীরের রক্ত থেকে কিডনী ফিল্টার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্জ্য এবং অতিরিক্ত পানি প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয়। কিডনী অকেজো হলে শরীরে বিষাক্ত পদার্থ জমতে থাকে ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। কিডনী গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরী করে যা শরীরের অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, শরীরে রক্ত তৈরি করা। কিডনী আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং ইলেক্ট্রোলাইট (ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম) এর পরিমান ও নিয়ন্ত্রন করে ।

কিডনী রোগের লক্ষণঃ

কিডনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথম দিকে কোন সমস্যা বুঝতে পারেন না। কারন প্রাথমিক পর্যায়ে কোন লক্ষন প্রতীয়মান হয় না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

তাই এই রোগকে বলা হয় নীরব ঘাতক। কিডনী রোগে যে সমস্ত উপসর্গগুলো দেখা যায় সেগুলো হলঃ

- ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে
- বমি বমি ভাব
- ক্লান্তি এবং দূর্বলতা
- চোখের চারপাশ, পা ও গোড়ালি ফুলে যাওয়া
- শ্বাসকষ্ট
- প্রস্রাবে রক্ত যাওয়া
- ক্ষুধামন্দা
- রক্তশূণ্যতা
- অনিদ্রা
- ত্বকফাটা ও চুল্কানি
- মানসিক ভারসাম্য হ্রাস

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের কয়েকটি কারন বা ঝুঁকিসম্পন্ন ফ্যাক্টরগুলো হলঃ

- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- কিডনীর প্রদাহ বা গোমেরুলোনেফ্রাইটিস, যা কিডনীর ছাঁকনি পর্দাকে ক্ষত-বিক্ষত করে
- ঔষধঃ দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ভাবে কিছু ঔষধ ; যেমনঃ ব্যথার বড়ি হিসেবে Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs), হার্টের জন্য ACEI গ্রুপের ঔষধ সেবন ইত্যাদি।
- জন্মগত কিডনী রোগ
- লুপাস এবং অন্যান্য অটোইমিউন রোগ (auto-immune diseases) যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ক্ষতি গ্রস্থ করে।
- ইউরিনারি সিস্টেমে কোন প্রতিবন্ধকতা জনিত কারণ, যেমনঃ বৃক্কে পাথর , টিউমার বা অর্বুদ, পুরুষের প্রস্টেট গ্রন্থির বড় হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।
- ঘন ঘন মূত্র সংক্রমণ বা (Urinary Tract Infection)
- রক্তে অতিরিক্ত চর্বি জমা
- ধূমপান
- স্থূলতা
- পরিবারে কারো কিডনী রোগ থাকলে
- বৃদ্ধ বয়স

জটিলতাঃ

ক্রনিক কিডনী রোগ আপনার শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশকে আক্রান্ত করতে পারে। সচরাচর যে জটিলতা গুলো দেখা দেয়:

- শরীরে পানি জমে যাওয়া। বিশেষ করে চোখের নিচের অংশে, পায়ের পাতায় প্রাথমিকভাবে পানি জমে ফুলে যায়। ধীরে ধীরে সারা শরীরে এই পানি ছড়িয়ে যেতে পারে। তাছাড়া শরীরের ভিতরের অর্গান বিশেষত ফুসফুসে ও হার্টে পানি জমে যায় এবং শ্বাসকষ্ট হয়।
- রক্তে হাইপারক্যালেমিয়া বা পটাসিয়ামের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় যা আপনার হার্টের ক্ষতি করতে পারে। এটি কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া বা অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন করে যা জীবন-হুমকির কারণ হতে পারে।
- হাড় ক্ষয় বা অস্টিওপরোসিস
- রক্তশূণ্যতা
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস

রোগ নির্ণয়ঃ

কিডনী রোগ নির্ণয়ের জন্য আপনাকে কিছু পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হতে পারে, যেমন:

- রক্ত পরীক্ষা ও কিডনী ফাংশন পরীক্ষাঃ ক্রিয়েটিনিন, ইউরিয়া, ই-জি.এফ.আর. (eGFR) এর পরিমান
- প্রস্রাব পরীক্ষা, বিশেষ করে প্রস্রাবে প্রোটিনের পরিমান
- পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগকে ৫টি ধাপে ভাগ করা হয়। এই ধাপগুলো করা হয় কিডনীর ফিলট্রেশন বা রক্ত ছাঁকন প্রক্রিয়ার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে, যাকে বলে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেশন রেট বা জি.এফ.আর (Glomerular filtration rate or G.F.R.)। মানব দেহে সুস্থ অবস্থায় কিডনীর জি.এফ.আর. হলঃ ১২৫ মিলি/মিনিট/১.৭৩ বর্গমিটার দেহের পৃষ্ঠ এলাকা। তবে কারো জি.এফ.আর. কমপক্ষে ৬০ মিলি/মিনিট এর উপরে থাকলে, কিডনী রোগের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক উপসর্গ না থাকলে এবং কিডনীর আকার ও গঠন স্বাভাবিক থাকলে সাধারনত তাকে কিডনী রোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কিডনীর কার্যক্ষমতা যত হ্রাস পায়, কিডনী রোগের ধাপ ততো

উপরে উঠতে থাকে। চতুর্থ বা পঞ্চম ধাপে যাওয়া মানে কিডনীর জি.এফ.আর. ৩০ মিলি/মিনিট এর কম এবং এ অবস্থা থেকে কিডনীর সুস্থ অবস্থায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রোগীকে ডায়ালাইসিস বা কৃত্রিম উপায়ে দেহের রক্তের বর্জ্য অপসারণের শরণাপন্ন হতে হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসাঃ

কিডনী একবার নষ্ট হলে তা পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। তাই এই রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী। সচেতন হলে স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনী রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

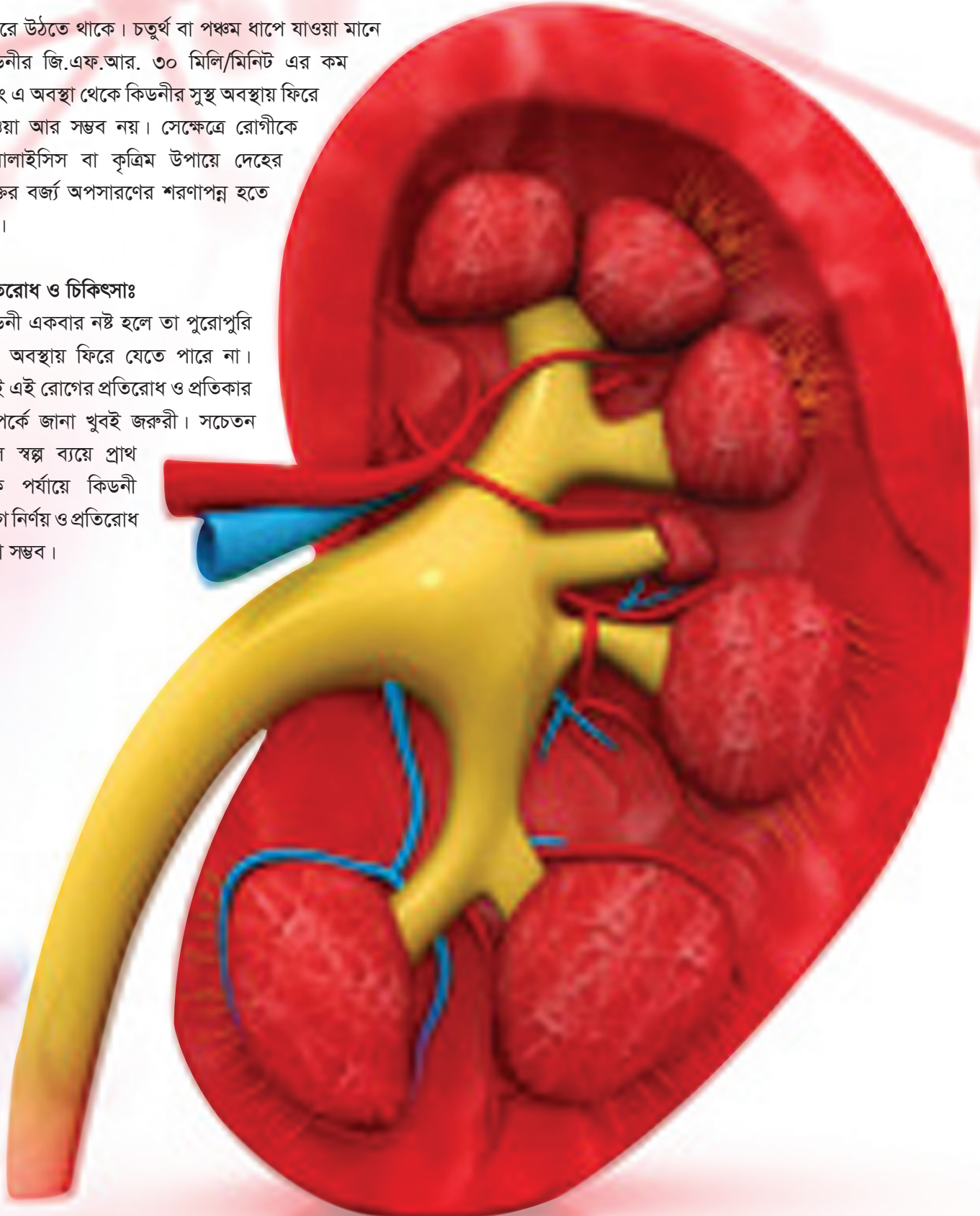

- কিডনী রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এমন প্রতিরোধযোগ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হোন। গবেষণায় দেখা গেছে, ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগী কিডনী রোগে ভুগে থাকে। উচ্চ রক্তচাপের কারণে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ রোগীর কিডনী অকেজো হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখলে কিডনীকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব।
- ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে ব্যথার বড়ি হিসেবে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ঔষধ সেবনে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
- নিয়মিত ব্যায়াম করুন, ওজন নিয়ন্ত্রনে রাখুন, পরিমিত আহার করুন। কিডনী রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষ খাদ্য তালিকা মেনে চলা উচিত।
- ধূমপান বর্জন করুন।
- নিয়মতান্ত্রিক ও সুশৃংখল জীবন যাপন করুন।
- শিশুদের ক্ষেত্রে টনসিলাইটিস, প্রস্রাবে প্রদাহ ও চর্মরোগের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করান।
- কিডনী যখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায় তখন ডায়ালাইসিস (Dialysis) অথবা কিডনী সংযোজন (Renal Transplant)হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। দু'টো কিডনী ৯০ শতাংশ অকেজো হওয়ার পরই ডায়ালাইসিস বা কিডনী ট্রান্সপ্ল্যান্টের প্রয়োজন হয়।

যে সকল খাবার গ্রহণে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ ঃ

কিডনী রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শ মত রেনাল ডায়েট মেনে চলতে হয়। এই রোগে যে সকল খাবার গ্রহণে সচেতনতা অবলম্বন করা দরকার সেগুলো হলঃ

- বিস্কুট
- কেক, মাফিন
- চকোলেট
- ওটমিল
- সিরিয়াল
- অ্যাভোকাডো
- ঢেঁড়স
- আলু
- পুঁই শাক
- টমেটো
- কামরাংগা
- অ্যাপরিকোট
- কমলা
- কলা
- আমলকি
- মাখন, পনির
- নারিকেল
- গরুর মাংস
- প্রক্রিয়াজাতকরন খাবার বা প্যাকেটজাত খাবার
- সস বা কেচাপ
- ফাস্ট ফুড

কিডনী নষ্ট হলে ডায়ালাইসিস করে চিকিৎসা করার সামর্থ্য খুব কম মানুষের-ই আছে। কিডনী একবার নষ্ট হলে তা কখনো পুরোপুরি ভালো হয় না। তাই এর প্রতিরোধের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিডনী রোগ চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল কিডনীকে আরো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা।

বাংলাদেশে যে হারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী ২০২০ সালে প্রায় তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগে আক্রান্ত হবে বলে জরিপে জানা গেছে। জেনে রাখা দরকার, প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার রোগী কিডনী অকেজো হওয়ার কারনে অকালে মৃত্যুবরণ করে। তাই আমাদের কিডনী রোগ সম্পর্কে জানা এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা সময়ের দাবী।

ডা. আসিফ ইয়াজদানী
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

নারীর দৃষ্টিতে বিশ্ব দেখে

অনন্যা

৩০ বছর ধরে
পারিবারিক ম্যাগাজিন হিসেবে দীপ্যমান

অনন্যা

নোটন হাউজ ১০/১৪ ইকবাল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২৯১৮৫৩০৩
মোবাইল : ০১৭৮৭৬৫৬৮৪৭
E-mail: anannya@bol-online.com
www.anannya.com.bd

অনন্যা পড়ুন কিনুন

অঠিক রোগ নির্ণয় বিড়ম্বনাময় ঃ বাতজ্বর (Rheumatic fever) বিড়ম্বনা

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। কথাটি বাস্তব সত্য। জীবনে সবাই সুস্থ থাকতে চায়। কিন্তু অসুখ-বিসুখ তো পার্থিব জীবনে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অসুখ-বিসুখে ভোগে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার ।

অসুখ-বিসুখ হলে ভুক্তভোগীরা সাধারণত সুবিধামতো পছন্দমতো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। অপরদিকে চিকিৎসকের পবিত্র দায়িত্ব সঠিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত কষ্ট উপশম তথা রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। অবশ্য যে কোন চিকিৎসা প্রদানের আগে সঠিকভাবে রোগনির্ণয় করা প্রত্যেক চিকিৎসকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সঠিকভাবে রোগনির্ণয় না করে চিকিৎসা শুরু করলে কত-যে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়েই কিছু বলতে চাই। বিষয়টি এমন হতে পারে যে আসলে রোগটি নেই কিন্তু ভুলভাবে রোগনির্ণয় করে তার চিকিৎসা দেয়া হয়। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে রোগ না-থাকা সত্ত্বেও তার চিকিৎসা দেয়া হয়। বিষয়টি অপ্রত্যাশিত, অগ্রহণযোগ্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে মারাত্মক। কেউ যদি কোন রোগে না-ভোগে অযথা কেন তাকে সে-রোগের চিকিৎসা দেয়া হবে? কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরকম করা হয়।

এমন ঘটনা শুধু যে আমাদের দেশেই ঘটে তা কিন্তু নয় বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কিন্তু কেন ঘটে? সে-ব্যাপারেই উদাহরণসহ একটু আলোকপাত করতে চাই। আশা করি এতে সচেতনতা বাড়বে এবং আমরা সংশ্লিষ্ট সবাই এই অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাব। অনেকেই অযথা অঠিক অযৌক্তিক চিকিৎসার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাবে।

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় বাতজ্বর (Rheumatic fever)। বিশেষ করে বাতজ্বর না-থাকা সত্ত্বেও কেন এত ব্যাপকহারে বাতজ্বর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং অযথা বাতজ্বরের চিকিৎসা দেয়া হয়? বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তব।

আমাদের কাছে প্রায়শই এমন রোগী বা রোগীর অভিভাবক এসে বলেন রোগীর বাতজ্বর আছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে বুঝলেন যে রোগীর বাতজ্বর হয়েছে? সাথে সাথে দৃঢ়তার সাথে ঝটপট উত্তর দিয়ে থাকেন রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। আর সাথে সাথে রক্ত পরীক্ষার একাধিক রিপোর্ট চোখের সামনে মেলে ধরেন যেখানে দেখা যায় কিছুদিন পর পর রক্তের এএসও টাইটার (ASO titre) পরীক্ষা করা হয়েছে যার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি। সবকিছু দেখে মনে হয় ভাবটা এমন যে রক্তের এএসও টাইটার (ASO titre)

স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে একটু বেশি মানেই বাতজ্বর একেবারে নিশ্চিত আর কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয়। শুধু রক্তের এএসও টাইটার (ASO titre) পরীক্ষা করে বাতজ্বর নির্ণয়ের কোন সুযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে এমন কোন সুনির্দিষ্ট রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কোন পরীক্ষা নেই যা দিয়ে বাতজ্বর সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

তবে কীভাবে বাতজ্বর সুনিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়? রোগীর সার্বিক উপসর্গ এবং লক্ষণাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং এর সাথে সুনির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেকটা নিশ্চিতভাবে বাতজ্বর (Rheumatic fever) চিহ্নিত করা যায়। এক কথায় বলতে গেলে বাতজ্বর নির্ণয়ের সুনির্দিষ্ট একক কোন পরীক্ষা নেই। কিন্তু অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য আমাদের মাঝে এমন অনেক চিকিৎসক আছেন যারা শুধু রক্তের এএসও টাইটার (ASO titre) বেশি পেলেই রোগীর বাতজ্বর (Rheumatic fever) শনাক্ত করে থাকেন এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা শুরু করে থাকেন। বিষয়টি মোটেও সমীচীন নয়। এতে রোগীর কোন উপকার হয়না বরং দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তি বাড়ে। সুতরাং চিকিৎসা শুরুর আগে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা অবশ্যই উচিত। কিন্তু সঠিকভাবে রোগীর বাতজ্বর (Rheumatic fever) নির্ণয়ের উপায় কি? এখন সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

অবশ্য বাতজ্বরের সূত্রপাত হতে পারে গলা ব্যথার দুই থেকে চার সপ্তাহ পর বিভিন্ন উপসর্গ ও লক্ষণ প্রকাশের মাধ্যমে। আবার গলা ব্যথা হলেই যে বাতজ্বর হবে তা কিন্তু নয়। গলা ব্যথার অনেক কারণ আছে তবে বিশেষ জীবাণুর কারণে গলা ব্যথা হলে পরবর্তীতে বাতজ্বরের সম্ভাবনা থাকে। বাতজ্বর নির্ণয়ের নির্ধারকসমূহ (Criteria) অর্থাৎ উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ দুই প্রকার। বড় নির্ধারকসমূহ (Major criteria) এবং ছোট নির্ধারকসমূহ (Minor criteria)। বড় নির্ধারকসমূহ (Major criteria) পাঁচটি এবং ছোট নির্ধারকসমূহ (Minor criteria) ছয়টি।

বড় নির্ধারকসমূহ (Major criteria) ঃ

১) গিরার প্রদাহ (Arthritis)
২) হৃৎপিন্ডের প্রদাহ (Carditis)
৩) অনিচ্ছাকৃত হাত-পা সঞ্চালন (Sydeham's chorea)
৪) ত্বকের লালচে দাগ(Erythema marginatum)
৫) ত্বকের নীচে গোটা (Subcutaneous nodules)

ছোট নির্ধারকসমূহ (Minor criteria) ঃ

১) জ্বর (Fever)
২) গিরার ব্যথা (Arthralgia)
৩) অতিরিক্ত ইএসআর এবং/অথবা সি আর পি (Raised ESR and/CRP)
৪) আগের বাতজ্বর (Previous rheumatic fever)
৫) অতিরিক্ত শ্বেতকণিকা (Leucocytosis)
৬) ই.সি.জিতে অতিরিক্ত পিআর বিরতি (Increased PR interval in E.C.G/First-degree heart block)

কোন রোগীর যদি দুইটি বড় নির্ধারক অথবা একটি বড় এবং দুইটি ছোট নির্ধারক থাকে তবে মনে করা হয় রোগী বাতজ্বরে (Rheumatic fever) আক্রান্ত। অবশ্য সাথে যদি এএসও টাইটার (ASO titre) স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে

তবে তা রোগ নির্ণয়ের সমর্থক মনে করা হয়। তবে শুধু এএসও টাইটার (ASO titre) স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকলেই বাতজ্বর বলা উচিত নয়। কিন্তু ভুল ধারণাবশত কিংবা অজ্ঞতাবশত অনেকেই শুধু এএসও টাইটার (ASO titre) স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকলেই বাতজ্বর চিহ্নিত করে থাকেন এবং দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা শুরু করে থাকেন। অবশ্য বাতজ্বরের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা খুব একটা সহজসাধ্য নয় বরং অনেক কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। আর এই দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ব্যাপারে রোগীর কিংবা রোগীর আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতা পাওয়াও সহজ নয়। তা ছাড়া রোগে না-ভুগে কেন অযথা অযৌক্তিক দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নিতে হবে?

অবশ্য বাতজ্বর সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয় না কিন্ত বাতজ্বরের ফলে হৃৎপিন্ডে স্থায়ী পরিবর্তন দেখা দিতে পারে যা আজীবন থাকে এবং পরবর্তী জটিলতা আরো মারাত্মক হতে পারে। সুতরাং সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা প্রদান অবশ্যই প্রয়োজন। বাতজ্বরের চিকিৎসা দেয়ার পর

পরবর্তীতে আর যাতে আবার না-হয় তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা নিতে হয়।

চিকিৎসাঃ

চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ উপশম করা এবং কোন স্থায়ী ক্ষতি প্রতিরোধ করা। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিশ্রাম, জীবাণুনাশক (Antibiotics), ব্যথানাশক বিশেষ করে এসপিরিন (Aspirin), গ্লুকোকর্টিকয়েডস (Glucocorticoids) এবং প্রয়োজনে হার্ট ফেইলিয়ুরের চিকিৎসা (Treatment of cardiac failure)।

বিশ্রামঃ গিরার ব্যথা এবং হৃৎপিন্ডের কার্যভার কমানোর জন্য বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের তাপমাত্রা, অতিরিক্ত শ্বেতকণিকা (Leucocytosis) এবং অতিরিক্ত ইএসআর (Raised ESR) স্বাভাবিক পর্যায়ে আসা পর্যন্ত বিশ্রাম প্রয়োজন।

জীবাণুনাশক (Antibiotics)ঃ বেঞ্জাথিন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন (১.২ মিলিয়ন ইউনিট) মাংসপেশিতে মাত্র এক বার অথবা ফেনোক্সিমেথাইল পেনিসিলিন ২৫০ মিলিগ্রাম বড়ি দিনে চারবার মুখে সেবন করতে হবে ১০ দিন।

ব্যথানাশক (Aspirin)ঃ গিরার ব্যথা উপশমের জন্য এসপিরিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

১) গ্লুকোকর্টিকয়েডস (Glucocorticoids)ঃ অতিরিক্ত গিরার প্রদাহ অথবা হৃৎপিন্ডের প্রদাহ (Carditis) থাকলে গ্লুকোকর্টিকয়েডস প্রয়োজন হতে পারে।

২)হার্ট ফেইলিয়ুরের চিকিৎসা (Treatment of cardiac failure)ঃ হার্ট ফেইলিয়ুর থাকলে তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে হবে।

একবার বাতজ্বর হলে যেহেতু আবার হতে পারে এবং হৃৎপিন্ডের স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে সেজন্য প্রথম পর্যায়ের চিকিৎসার পর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দিতে হয়। বেঞ্জাথিন বেঞ্জাইল পেনিসিলিন (১.২ মিলিয়ন ইউনিট) মাংশপেশিতে প্রতি মাসে একবার অথবা ফেনোক্সিমিথাইল পেনিসিলিন ২৫০ মিলিগ্রাম বড়ি দিনে দুইবার মুখে সেবন করতে হবে। শেষ বাতজ্বরের পর দশ বছর অথবা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেটি দীর্ঘতম সেই সময় পর্যন্ত এই প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা চালাতে হবে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুর রহিম
বিভাগীয় প্রধান, ইন্টারনাল মেডিসিন,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

বাড়তি মেদ ঝরাতে টমেটোর কেরামতি

টমেটোর গুণাগুণ সবাই জানেন, কিন্তু এই গুণগুলোর পাশাপাশি টমেটো যে চর্বি কমাতেও সাহায্য করে তা অনেকেরই অজানা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাঁচা টমেটো দিনে ৪ থেকে ৫টা খাদ্য তালিকায় রাখলে শরীরে কোলিসিসটোকাইনিন (cholecystokinin) নামে এক ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় যা পেটের এবং ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে যে ভালভ রয়েছে তা সংকুচিত করে দেয়। ফলে পেট ভরা থাকে, খিদে কম পায়। আর তাতে ওজন বাড়ার সম্ভাবনাও থাকে না।
এছাড়াও টমেটোর মধ্যে রয়েছে আরও বিশেষ কিছু গুণাগুণ, আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই গুণগুলি কী কী-

১. ইনসুলিন নিঃসরণ কমে এবং ওজন বৃদ্ধির হরমোন নিয়ন্ত্রণে থাকে ঃ

খাদ্য হিসেবে এটা অত্যন্ত কম ক্যালরিযুক্ত। একটা ছোট টমেটোতে ক্যালরির মাত্রা থাকে মাত্র ১৬। এছাড়া, টমেটোতে থাকে প্রাকৃতিক শর্করা। যা 'গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স' সমৃদ্ধ। এটি রক্তের শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখে। ফলে ইনসুলিন নিঃসরণ কমে যায় এবং যে হরমোন চর্বি সঞ্চয় ও ওজন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে সেটিও নিয়ন্ত্রিত থাকে।

২. ডায়াবেটিস বা কিডনীর সমস্যা রোধ করে ঃ

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ছাড়াও শরীরের অন্যান্য বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে টমেটো বেশ উপকারি। যেমন ডায়াবেটিস বা কিডনীর সমস্যা রুখতেও এটি সাহায্য করে। এছাড়াও রোগ প্রতিরোধে টমেটোর আরও বেশ কয়েকটি গুণ বর্তমান।

৩. হাড় ভালো রাখে ঃ

টমেটোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন কে রয়েছে। এগুলো হাড়ের টিস্যু ঠিকঠাক রাখতে ও ছোটখাটো হাড় সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

৪. চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় ঃ

চোখের দৃষ্টি উন্নত করতে টমেটোর ভূমিকা অপরিসীম। তাই রোজ খাদ্যতালিকায় টমেটো থাকলে তা আপনার চোখের জন্য উপকারি।

৫. ধূমপানের ক্ষতি কমায় ঃ

আবার ধূমপানের ফলে শরীরে যে ক্ষতি হয় তার প্রভাব কমাতে পারে টমেটো। এতে বিদ্যমান রয়েছে সাইট্রিক এসিড(Citric Acid), অ্যাসকরবিক এসিড (Ascorbic Acid) ও ম্যালিক এসিড (Malic Acid) । যা শরীরে ধূমপান থেকে ক্ষতি কমাতে বিরাট সাহায্য করে।

৬. ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে ঃ

এছাড়াও, টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, সি ও বিটা ক্যারোটিন রয়েছে। এগুলো এন্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে, রক্তের ক্ষতিকারক রাসায়নিকের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখে। টমেটো যত লাল হবে তত বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকবে। তবে রান্নার ফলে নষ্ট হয়ে যায় টমেটোর মধ্যে থাকা ভিটামিন সি।

সূত্র:অনলাইন

স্তন ক্যান্সার ঃ জানতে হবে

আমাদের দেশের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই গোপন রাখার প্রবণতা দেখা যায় । স্তন ক্যান্সার তেমনই একটি বিষয় । বিশেষত আমাদের দেশে নারীরা স্তন বিষয়ক যে কোন সমস্যাই এড়িয়ে যান অথবা এ বিষয়ে কারো সাথে পরামর্শ করতে চান না । এমতাবস্থায় সার্বিক চিন্তা ভাবনার যেমন পরিবর্তন দরকার তেমনি নিজেও সচেতন হওয়া জরুরী । স্তন ক্যান্সার বিষয়ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকলে ক্যান্সারের খারাপ পর্যায়ে যাওয়ার আগেই রোগ শনাক্তকরণ এবং নির্মূল সম্ভব ।

আলোকপাত ঃ

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার বিবেচনায় ত্বকের ক্যান্সারের পরই স্তন ক্যান্সারের অবস্থান । মনে রাখতে হবে শুধু নারী নয়, পুরুষ ও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে । আগে এ রোগে মৃত্যুর হার বেশি থাকলেও এখন তা অনেকটাই কমে এসেছে । এর মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সচেতনতা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি শনাক্তকরণ । একটি সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৭ সালে সারা বিশ্বে প্রায় ২,৫২,১৭০ জন নতুন রোগী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে । এমতাবস্থায় নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রাথমিক কিছু বিষয় সবারই জানা থাকা দরকার ।

উপসর্গঃ

স্তন ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে নিজে নিজে নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করা যাকে বলা হয় BSE (Breast Self Examination). নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো দেখা দিলে দেরী না করে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে।

- স্তনে গোটা অনুভূত হওয়া বা শরীরের আশেপাশে জায়গার তুলনায় স্তন বেশি শক্ত মনে হওয়া
- স্তনের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া
- স্তনের চামড়ার পরিবর্তন হওয়া বা চামড়া ভিতরে ঢুকে যাওয়া
- স্তনের বোঁটা ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া
- স্তনের বোঁটার চারদিকের কালো জায়গার পরিবর্তন লক্ষ্য করা
- স্তনের চামড়া লাল হয়ে যাওয়া বা কমলার খোসার মত হয়ে যাওয়া

স্তন ক্যান্সারের কারণঃ

আমাদের স্তনের দুটি অংশ থাকে- গ্রন্থি এবং গ্রন্থিনালী। ক্যান্সার এ দুটি অংশের যে কোনটিতে শুরু হতে পারে । ক্যান্সার আবার দুই ধরণের হয়- বিনাইন (Benign) ও ম্যালিগনেন্ট (Malignant) . বিনাইন ক্যান্সার সাধারণত স্তনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকে । অন্যদিকে ম্যালিগনেন্ট ক্যান্সার আমাদের রক্তনালী (blood vessel) এবং লসিকানালীর (lymph vessels) মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে যা মারাত্মক ।

সাধারণত হরমোন, জীবনযাত্রার ধরণ এবং কিছু পরিবেশগত উপাদান স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তবে এসব ঝুঁকির উপস্থিতি ছাড়াও স্তন ক্যান্সার হতে পারে যার কারণ জানা যায়নি । ৫-১০% স্তন ক্যান্সার বংশগত কারণে হয়ে থাকে । বিশেষত যদি কারো মা, বোন বা মেয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে । BRCA1 এবং

BRCA2 এ দুটি জীন উপস্থিত থাকলে স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যায় ।

আরো কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলে স্তন ক্যান্সার হতে পারে তবে এমন নয় যে এগুলো থাকলে স্তন ক্যান্সার হবেই

- মহিলারা পুরুষের চেয়ে স্তন ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয় ।
- বয়স বৃদ্ধি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বৃদ্ধি করে ।
- কারো যদি স্তনের টিস্যু পরীক্ষা করে কোন অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায় তবে তার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । আবার এক স্তনে ক্যান্সার হলে আরেক স্তনে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেকগুণ বেড়ে যায় ।
- রেডিয়েশন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
- স্থূলতা ক্যান্সারের অন্যতম নিয়ামক ।
- কম বয়সে রজঃপাত শুরু (১২ বছরের আগে) অথবা বেশি বয়সে রজঃনিবৃত্তি (৪৫ বছরের পরে) হওয়া ।
- আজকাল সবাই বেশি বয়সে সন্তান নিতে চান । এটাও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
- যে কখনও গর্ভবতী হয়নি তার স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে ।
- রজঃনিবৃত্তির পর হরমোন থেরাপী নেওয়া বা অ্যালকোহল পান করাও স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয় ।
- কিভাবে প্রতিরোধ সম্ভব স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিগুলো জানলেই তা অনেকখানি প্রতিরোধ করা সম্ভব । যাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো আছে তারা সাধারণ কয়েকটি নিয়ম জানলেই স্তন ক্যান্সার থেকে রক্ষা পেতে পারেন । সবচেয়ে দরকারি হল

জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তন

- নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করতে হবে । বছরে অন্তত একবার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে হবে। ব্রেস্ট স্ক্রিনিং এর জন্য শারীরিক পরীক্ষা, ম্যামোগ্রাম ইত্যাদি টেস্ট করাতে হবে । তবে সবক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।
- নিজে নিজেই স্তন বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং BSE এর সাথে সুপরিচিত হতে হবে । স্তনে কোন রকম পরিবর্তন দেখা দিলে চিকিৎসকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে ।
- অ্যালকোহল, ধূমপান পরিহার করতে হবে ।
- প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করতে হবে । প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট ব্যায়ামের জন্য ব্যয় করতে হবে
- রজঃনিবৃত্তির পরে হরমোন থেরাপী নিলে তা উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি করবে কি না তা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে । দরকার হলে ওষুধের ডোজ কমিয়ে থেরাপী নিতে হবে ।
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । নিয়মিত ব্যায়ামের সাথে সাথে সুষম খাবার খেতে হবে ।
- স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে । অলিভ অয়েল, বাদাম, শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মটরশুটি ইত্যাদি স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ।
- যাদের স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষে ঔষধ (Preventive Medication) গ্রহণ করতে পারেন ।

পরিশেষঃ

স্তন ক্যান্সার বিষয়ে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারই রোগটিতে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ । একমাত্র যথাযথ জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত যত্নই পারে এ রোগের ঝুঁকি কমাতে ।

ডাঃ শায়লা আজিজ

ক্যালসিয়াম কেন খাবেন?

ক্যালসিয়াম আমাদের দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান। এই ক্যালসিয়ামের একটি বড় অংশ আমরা পাই দৈনন্দিন খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে। তাই আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় ক্যালসিয়াম অপরিহার্য। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকেই খুব একটা ভাবতে আগ্রহী হন না। আর উঠতি বয়সীরা তো আরও উদাসীন। তারা অনেকে ক্যালসিয়ামের অভাবে ভুগছেন। আর যখন তারা ক্যালসিয়াম গ্রহণে আগ্রহী হন, তখন বেশ অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়।

এখানে ক্যালসিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

দেহে ক্যালসিয়ামের কার্যকারিতাঃ

* হাঁড় মজবুত করে।
* পেশীর সংকোচন এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ঠিক রাখে।
* রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।
* হরমোন নিঃসরণ ও দেহের বিভিন্ন রকম কোষের বিভাজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
* দেহের ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এবং কোথাও কেটে বা ছিঁড়ে গেলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।
* রাসায়নিক দূষণ থেকে দেহকে রক্ষণ করে। ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া থেকে দেহকে বাঁচাতে ক্যালসিয়াম অন্যতম উপাদান। বিশেষত যারা কল-কারখানায় কর্মরত বা শিল্প এলাকায় বসবাস করেন। ঢাকার মতো যে সব শহরে হাওয়া বিপুল পরিমাণ সীসা ঘুরে বেড়ায়, সে সব শহরের মানুষের নিয়মিত ক্যালসিয়াম খাওয়া প্রয়োজন।
* অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ হতে ইনসুলিন নিঃসৃত হতে সাহায্য করে ফলে ডায়াবেটিস এবং এর কারণে চোখ, কিডনী, হৃদযন্ত্র বা ত্বকের সমস্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখুন। দেহের ভিতরে ক্যালসিয়ামের মূল আবাস হল হাঁড় ও দাঁত। একই সাথে রক্তেও কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হওয়া জরুরী। কেননা এখান থেকেই শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্যালসিয়াম বণ্টন হয়। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে শরীরের চাহিদা মেটাতে হাঁড়ে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম রক্তে আসতে থাকে যার ফলে হাঁড় ক্ষয় শুরু হয়। রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখলে হাঁড় ও দাঁত মজবুত থাকে।

মেয়েদের বেশি করে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়ঃ

* অস্থিতে ক্যালসিয়ামের সমতা বজায় রাখে হরমোন। হরমোনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার তারতম্যের জন্য

ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি বেশি করে হয়।

* খনিজ পদার্থ ও কোষ-কলা অস্থির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ দুই উপাদানের উৎপত্তি এবং ক্ষয়ের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোন ও ভিটামিন ডি দ্বারা।
* জন্মবিরতিকরণ বড়ি ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণ হতে পারে। তাই এসব খাবার বড়িও নিয়মিত খেয়ে যাওয়া উচিত নয়।
* অস্থি ক্ষয় ও অস্থি তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্যহানি ঘটার কারণেই অস্টিও পোরোসিসের সূত্রপাত হয়। ফলে সামান্য আঘাতেই হাঁড়ে চিড় ধরা, হাঁড় ভাঙা থেকে শুরু করে একেবারে চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এত নিঃশব্দে এর আগমন ঘটে যে, আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের ক্যালসিয়াম ঘাটতির কথা।

ওষুধ ও ক্যালসিয়াম ঘাটতিঃ

* এ্যান্টাসিড, অবসাদ কমাবার ওষুধ, ডাইইউরেটিকস(DIURETICS) বা পানি কমাবার ওষুধ এপিলেন্সির ওষুধ, বেদনানাশক ওষুধ দীর্ঘদিন সেবনের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
* মানসিক অবসাদ ও ডিপ্রেশনে ভুগছেন এমন অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ক্যালসিয়ামের অভাবে ভুগছেন তিনি।
* উচ্চ রক্তচাপ ও অস্থির ক্যান্সার দেখা দিতে পারে ক্যালসিয়ামের দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতিতে।
* এ্যাকজিমা জাতীয় চর্মরোগ, মানসিক অস্থিরতা, অল্পতেই মেজাজ বিগড়ে যাওয়া,নখ, মাংস পেশীর খিঁচ ধরা ইত্যাদি ক্ষেত্র বিশেষে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে দেখা দেয়।

ক্যালসিয়াম ও খাদ্যাভ্যাসঃ

* নিয়মিত বেশি পরিমাণে প্রাণিজ আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য ডায়েটারি ফ্যাট। রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। প্রাণিজ আমিষ শরীরে প্রচুর ফসফরাস উৎপন্ন করে, যা ফলশ্রুতিতে প্রস্রাবের সাথে ক্যালসিয়ামকে বের করে দেয়। বিশেষভাবে তৈরি ও সংরক্ষণ করা খাদ্যদ্রব্য ও একই কাজ করে।
* সমীক্ষায় দেখা গেছে, পঞ্চাশোর্ধ বয়সে যারা নিরামিষ খান, আমিষভোজীদের চেয়ে তাদের দেহে

ক্যালসিয়ামের মাত্রা ভাল থাকে।

* অন্ত্রে ক্যালসিয়াম আত্তীকরণে বাধা দেয় এ্যালুমিনিয়াম, এন্টাসিড ট্যাবলেট, বেকিং পাউডার, চা, টুথপেস্ট, বিট লবণ থেকে এ্যালুমিনিয়াম আমাদের দেহে প্রবেশ করে। তাই এসব পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করাই শ্রেয়। এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করা উচিত নয়।
* সোডা ও কোমল পানীতে খাবেন, চিনি ও ফসফেট থাকে, যা ক্যালসিয়াম আত্তীকরণে বাধার সৃষ্টি করে। এরা দেহে ক্যালসিয়ামের ব্যবহারেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
* দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যে ক্যালসিয়াম আছে। তবে এরই সাথে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ অন্যান্য খাবারও খাওয়া উচিত। কেননা প্রাণিজ খাদ্য হিসেবে দুধেও ফসফরাস থাকে যা ফসফেট তৈরি করে তাই দুধ ও অন্যান্য খাবারের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত।

ক্যালসিয়ামের উৎস :

মাছ	মাংস ও অন্যান্য	শষ্যদানা
বাছা মাছ -৫২০		
বেলে মাছ -৩৭০	গরুর মাংস ১০	চাল -১০
ভেটকি মাছ -৪৮০	ডিম (হাঁসের) -৭০	ময়দা -৪১
চেলা মাছের শুটকি-৩৫৯০	ডিম (মুরগির) -৬০	আটা -৪৮
কাতলা মাছ -৫৩০	মুরগীর মাংস -২৫	সেমাই -২২
মাগুর মাছ -১৮০৪	খাসির মাংশ -১২	সুজি -১৩
খৈলশা মাছ -৪৬০	খাসির কলিজা -১৭	চিড়া -২০
কই মাছ -৪১০	ভেড়ার মাংস -১৫০	সুরি -২৩
চিংড়ি -৩২৩	গরুর দুধ -১২০	ছোলা -২০২
পুঁটি মাছ ১১০	ছাগলের দুধ -১৭০	মাষ কলাই -১৫৪
রুই মাছ -৬৫০	দই -১৪৯	মশুর ডাল -৭৫
চিংড়ির শুঁটকি -৪৩৮৪	সন্দেশ-০২০৮	মুগ ডাল -৭৫
শিং মাছ -৬৭০	পায়েশ -৩৮৮	চিনি -১২
টেংরা মাছ -২৭০	পান -২৩০	রুটি -১১

শাক সবজি ফল/মসলা

লাউ শাক-৮০	পুঁই শাক-১৬৪	সিম বিচি-৬০	পেয়ারা-২০	তেঁতুল-১৭০
কচু শাক-৪৬০	পাট শাক-১১৩	ঢেঁড়শ-১১৬	আম-১৬	আপেল-৫৬
লেটু শাক-৫০	ডাঁটা শাক-৮০	বরবটি-৩৩	ডাব-১৫	আমলকি-৩৪
সরিষার পাতা-১৫৫	মুলা শাক-২৮	ঝিঙা-১৬	কাঁঠাল-২৬	বেল-৩৮
লাল শাক-৩৭৪	ধনে পাতা-১৮৪	কাঁচা পেঁপে-১৩	কালো জাম-২২	বড়ই-১১
কলমি শাক-১০৭	গাজর-২৭	কাঁচা টমেটো-২০	পেঁপে-৩১	লিচু-৯০
কাঁচা মরিচ-১১	সিম-২১০	বেগুন-১১	আমড়া-৫৫	রসুন-৩০
	বাঁধাকপি-৩১	করল্লা -২৩	কমলা-৪০	পেঁয়াজ-১০৪০
			কলা-১৩	জিরা-১০৪০
				হলুদ-১৫০

কতটা ক্যালসিয়াম প্রয়োজন :

১০-৩০ বছর বয়সীদের দৈনিক ১০০০-২০০০ মিলিগ্রাম

১০ বছরের কম এবং ৩০ বছরের বেশি বয়স্কদের দৈনিক ৮০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। রজঃনিবৃত্ত মহিলা ও যারা হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপীতে ছিল তাদের প্রতিদিন ১৫০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়।

গর্ভধারণ ও সন্তানকে স্তন্যদানের সময় প্রত্যহ ১৫০০ থেকে ২০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম খাওয়ানো প্রয়োজন।

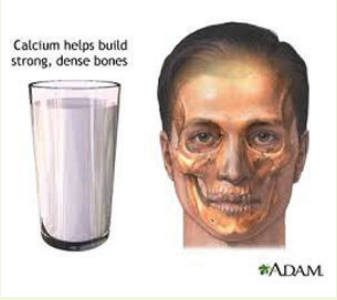

দৈনিক ২০০ মিলিগ্রামের কম ক্যালসিয়াম গ্রহণ করলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিবে। স্বাভাবিকভাবে নিয়মিত সুষম খাদ্য খেলে শরীরের ক্যালসিয়ামের চাহিদা মিটে যায়। বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বেড়ে উঠার সময় অর্থাৎ ১৫ বা ৩০ বছর পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়।

সব ক্যালসিয়ামই এক নয় :

বাজার থেকে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট কেনার সময় তাতে কি আছে তা দেখে নিন। ক্যালসিয়াম আরোটেট, ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট এবং ক্যালসিয়াম সাইট্রেট সবচেয়ে ভাল। এর প্রায় ৪০% ক্যালসিয়াম দেহে আত্তীকৃত হয়। ক্যালসিয়ামের কার্বোনেট ততটা কার্যকর নয়। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কোনো কাজেই আসে না।

সতর্কতা :

কিডনীর সমস্যা, কিডনী বা মূত্রাশয়ে পাথর থাকলে ক্যালসিয়াম বড়ি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সেবন করবেন না।
কোষ্ঠকাঠিন্য ও রক্তশূন্যতায় ভুগলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ক্যালসিয়াম খাবেন না।

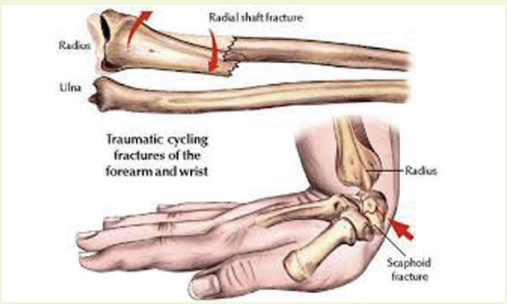

ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যৌথভাবে কাজ করে। তাই ক্যালসিয়াম বেশি গ্রহণ করলে ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদাও বেড়ে যায়; তাই এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

ডাঃ রোখসানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক (ফিজিওলজী)
বিক্রমপুর ভূইয়া মেডিকেল কলেজ

রাতে খাবার দেরি করে খেয়ে নিজেই বাড়াচ্ছেন ক্যানসারের ঝুঁকি!

আমাদের অনেকেরই রাতে দেরি করে ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাস রয়েছে। রাত দশটা এগারোটার আগে রাতের খাবারের কথা ভাবতেই পারেনা অনেকে। আবার এগারোটার পরে খাবার গ্রহন করা লোকের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু আমরা জানিনা যে নিয়মিত এ অভ্যাসটি কত বড় বিপদ ডেকে আনছে আমাদের অজান্তেই।

স্বাস্থ্যবিশারদদের মতে যারা ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে নৈশভোজ সারেন তাঁরা ব্রেস্ট ও প্রস্টেট ক্যানসারের ছোবল থেকে নিরাপদেই থাকেন।

তুলনামূলক ভাবে শহরে লোকের মাঝে এ অভ্যাসটির প্রচলন বেশি। সাধারনত কাজ থেকে ঘরে ফিরতেই অনেকের রাত আটটা নয়টা বেজে যায়। পরিবার কে সময় দেয়া বা অন্যান্য বিষয়ে কম বেশি সবারই রাতের খাবার গ্রহনের সময়টা পিছিয়ে যায়।

গ্রামাঞ্চলের বিষয়টা ভিন্ন। টেলিভিশন দেখলেও খাবারের সময়টা এখনও নয়টার আগেই

তাই গ্রামবাসীর মধ্যে এখনও তুলনামূলক নিরাপদে আছেন প্রস্টেট ক্যানসার ও ব্রেস্ট ক্যানসারের মতো মরন ব্যাধি । এমনিতেই কর্কট রোগ গোটা বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের আবহ তৈরি করে রেখেছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুড়ান্ত চিকিৎসা সহায়তা দিয়েও কর্কট রোগের ছোবল থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না।

রোগের শুরুতে ধরা পড়লেও চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অনেকে। ভাগ্যবানরা লড়াই করে নতুন জীবন ফিরে পান। তবে সেই সব ভাগ্যবানদের সংখ্যাটাও উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

তাই ক্যানসার রুখতে রোগের প্রবনতাকেই রুখে দিতে চাইছেন চিকিৎসকরা। গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন প্রস্টেট ক্যানসার ও ব্রেস্ট ক্যানসারের সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে।

এই ভয়াবহতা রুখতেই নারী ও পুরুষের উপরে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সেই সমীক্ষা রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে ৮৭২জন পুরুষের মধ্যে ৬২১ জন প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত।

একইভাবে ১,৩২১ জন মহিলার মধ্যে ১,২০৫ জন মহিলা ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত।

আক্রান্ত পুরুষ-মহিলার দৈনন্দিন খাদ্যাভাসের মূল্যায়ন করে দেখা গিয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগের খাবার সময়ের কোনও সামঞ্জস্য নেই। নৈশভোজের সময় আসতে আসতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে যায়।

অনেকে কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করার জন্য রাতের শিফটে অফিসে থাকেন। তাঁরা সাধারণত রাত করেই খাওয়াদাওয়া সারেন। কিন্তু রাত ন'টার আগে যারা খেয়ে নেন তাঁরাই এক্ষেত্রে নিরাপদ জোনে রয়েছেন।

বাকিদের উপর থেকে কিন্তু কর্কট রোগের ভ্রুকুটি এখনই যাচ্ছে না। তাই রাতে যতক্ষণই কাজ করুন না কেন ন'টার আগে নৈশভোজ সারার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এলার্জিজনিত রোগ ও চিকিৎসা

এলার্জি রোগের প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে অনেক বেশি। বাচ্চা থেকে বুড়ো- প্রায় সবাই এই রোগে কোন না কোন সময়ে আক্রান্ত হয়। এলার্জিতে হাঁচি কাশি থেকে শুরু করে খাদ্য ও ওষুধের ভীষণ প্রতিক্রিয়া ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে এলার্জি সামান্যতম অসুবিধা করে আবার কারও ক্ষেত্রে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় ধূলো এসে লাগল মুখে, তখনই শুরু হয়ে গেল হাঁচি এবং পরে শ্বাসকষ্ট অথবা ফুলের গন্ধ নেয়ার সময় বা গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, গরুর দুধ খেলেই শুরু হলো গা চুলকানি বা চামড়ায় লাল লাল চাকা হয়ে ফুলে ওঠা। এগুলো হলে আপনার এলার্জি আছে ধরে নিতে হবে।

এলার্জি কী? কেন হয় এবং কী করেই বা এড়ানো যায়? তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রত্যেক মানুষের শরীরে এক একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম থাকে, কোন কারণে এ ইমিউন সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে তখনই এলার্জির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এলার্জিঃ

আমাদের শরীরে কোন ক্ষতিকর বস্তু (পরজীবী, ছত্রাক, ভাইরাস, এবং ব্যাকটেরিয়া) বা অনাহূত বস্তু (ফরেইন বডি) প্রবেশ করলে দেহ সবসময় তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাকে রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া বা ইমিউনিটি বলে। কিন্তু কখনও কখনও আমাদের শরীর সাধারণত ক্ষতিকর নয় এমন অনেক ধরনের বস্তুকেও ক্ষতিকর ভেবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। সাধারণত ক্ষতিকর নয় এমন সব বস্তুর প্রতি শরীরের এ অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে এলার্জি বলা হয়।

এলার্জিজনিত প্রধান সমস্যাসমূহঃ

- এলার্জিজনিত সর্দি বা এলার্জিক রাইনাইটিসঃ এর উপসর্গ হচ্ছে অনবরত হাঁচি, নাক চুলকানো, নাক দিয়ে পানি পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারও কারও চোখ দিয়েও পানি পড়ে এবং চোখ লাল হয়ে যায়।
- এলার্জিক রাইনাইটিস দুই ধরনের

১। সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিস : বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এলার্জিক রাইনাইটিস হলে একে সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

২। পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস : সারা বছর ধরে এলার্জিক রাইনাইটিস হলে একে পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস বলা হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গঃ

* **সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিস :**

- ঘন ঘন হাঁচি
- নাক দিয়ে পানি পড়া
- নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া
- চোখ দিয়ে পানি পড়া
- চোখ লাল হওয়া ও চোখ চুলকানো ইত্যাদি।

* **পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিস :** পেরিনিয়াল এলার্জিক রাইনাইটিসের উপসর্গগুলো সিজনাল এলার্জিক রাইনাইটিসের মতো। কিন্তু এক্ষেত্রে উপসর্গগুলোর তীব্রতা কম হয় এবং স্থায়ীত্ব বেশি হয়।

চিকিৎসা ও প্রতিকারঃ

- ধুলোবালি থেকে দূরে থাকা। রাস্তায় বের হওয়ার সময় ফেসমাস্ক ব্যবহার করা।
- যাদের অ্যালার্জির প্রবণতা আছে তাদের খাবার

গ্রহনে সাবধানতা অবলম্বন করা। একেক জনের একেক খাবারের প্রতি সেনসিটিভিটি থাকে। সাধারনত গরুর মাংস, চিংড়ি, বেগুণ, ইলিশ মাছ ইত্যাদি খাবারের প্রতি সেনসিটিভিটি থাকে। এছাড়া অন্য যেকোন খাবারের প্রতি থাকতে পারে অ্যালার্জির প্রবনতা।

- ভিটামিন সি যুক্ত ফল খাওয়া।
- ডাক্তারের পরামর্শ মত অ্যান্টি-হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ সেবন এবং প্রয়োজন হলে ইমিউনোলজিক্যাল পরীক্ষা করা।

এজমা বা হাঁপানি :

এজমা রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গ বা লক্ষণগুলো হলো-

- ঘন ঘন শুষ্ক কাঁশি
- শ্বাস নিতে ও ছাড়তে কষ্ট
- দম বন্ধ ভাব বা খাটো অর্থাৎ ফুসফুস ভরে দম নিতে না পারা
- বুকের ভেতর বাঁশির মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ
- রাতে ঘুম থেকে উঠে বসে থাকা

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাঃ

- বুকের এক্স-রে : হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার আগে অবশ্যই বুকের এক্স-রে করে দেখা দরকার যে অন্য কোনো কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা।
- স্পাইরোমেট্রি বা ফুসফুসের ক্ষমতা দেখা : এটা পরীক্ষা করে রোগীর ফুসফুসের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলার বা ওষুধ সেবন করা।
- হাঁপানি রোগের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার নেই। তবে কাশি বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে এমন ঠান্ডা পরিবেশ পরিহার করা, অ্যালার্জেন থেকে দূরে থাকা, দূষনমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরনের মাধ্যমেই এর প্রতিরোধ সম্ভব।

আর্টিকেরিয়া :

আর্টিকেরিয়ার ফলে ত্বকে লালচে ফোলা ফোলা হয় এবং ভীষণ চুলকায়। ত্বকের গভীর স্তরে হলে, মুখ, হাত-পা ফুলে যেতে পারে। আর্টিকেরিয়ার ফলে সৃষ্ট ফোলা অংশগুলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী থাকে কিন্তু কখনও কখনও বার বার হয়। যে কোনো বয়সে আর্টিকেরিয়া হতে পারে। তবে স্বল্পস্থায়ী আর্টিকেরিয়া বাচ্চাদের মধ্যে এবং দীর্ঘস্থায়ী আর্টিকেরিয়া বড়দের মধ্যে দেখা যায়।

সংস্পর্শজনিত এলার্জিক ত্বক প্রদাহ/ এলার্জিক কনটাক্ট ডারমাটাইটিস :

চামড়ার কোথাও কোথাও শুকনো, খসখসে, ছোট ছোট দানার মতো ওঠা। বহিস্থ উপাদান বা এলার্জেনের সংস্পর্শে ত্বকে প্রদাহ হলে তাকে এলার্জিক কনটাক্ট ডারমাটাইটিস বলা হয়।

লক্ষণ ও উপসর্গঃ

- ত্বকে ছোট ছোট ফোঁসকা পড়া
- ফোঁসকাগুলো ভেঙে যাওয়া ও চুয়ে চুয়ে পানি পড়া
- ত্বকের বহিরাবরণ ওঠে যাওয়া
- ত্বক লালচে হওয়া এবং চুলকানো
- চামড়া ফেটে আঁশটে হওয়া

একজিমা :

একজিমা বংশগত চর্মরোগ যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়, চুলকায়, আঁশটে এবং লালচে হয়। খোঁচানোর ফলে ত্বক পুরু হয় ও কখনও কখনও ওঠে যায়। এর ফলে জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ত্বক থেকে চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে এবং দেখতে ব্রণ আক্রান্ত বলে মনে হয়। এটা সচরাচর বাচ্চাদের মুখে ও ঘাড়ে এবং হাত ও পায়ে বেশি দেখা যায়।

এলার্জিক কনজাংটিভাইটিস :

- চোখে চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া

খাওয়ায় এলার্জি :

উপসর্গঃ পেটে ব্যথা, বমি বমি ভাব, বমি হওয়া এবং ডায়রিয়া।

এলার্জি

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া জনিত এলার্জি :

এটা খুবই মারাত্মক। এলারজেন শরীরের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটা শুরু হয়ে যেতে পারে। নিম্নে উল্লিখিত উপসর্গগুলো হতে পারেঃ-

- চামড়া লাল হয়ে ফুলে ওঠে, চুলকায়
- শ্বাসকষ্ট, নিশ্বাসের সঙ্গে বাঁশির মতো আওয়াজ
- মূর্ছা যেতে পারে
- রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগী শকে চলে যেতে পারে বা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

সাধারণ এলার্জি উৎপাদকগুলো :

- মাইট
- মোল্ড
- ফুলের রেণু বা পরাগ
- ঠান্ডা এবং শুষ্ক আবহাওয়া
- খাদ্যদ্রব্য
- ঘরের ধুলো ময়লা
- প্রাণীর পশম এবং চুল
- পোকা মাকড়ের কামড়
- ওষুধসহ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি
- প্রসাধন সামগ্রী, উগ্র সুগন্ধী বা তীব্র দুর্গন্ধ

প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

- রক্ত পরীক্ষা বিশেষত : রক্তে ইয়োসিনোফিলের মাত্রা বেশি আছে কিনা, তা দেখা।
- সেরাম ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই এর মাত্রা : সাধারণত এলার্জি রোগীদের ক্ষেত্রে আইজিইর (IgE)মাত্রা বেশি থাকে।
- স্কিন টেস্ট : এ পরীক্ষায় রোগীর চামড়ার উপর বিভিন্ন এলার্জেন দিয়ে পরীক্ষা করা হয় এবং এ পরীক্ষাতে কোন কোন জিনিসে রোগীর এলার্জি আছে তা ধরা পড়ে।
- প্যাচ টেস্ট : এ পরীক্ষায় রোগীর ত্বকের ওপর করা হয়।
- বুকের এক্স-রে

সমন্বিতভাবে এলার্জির চিকিৎসা হলো :

- এলার্জেন পরিহার : যখন এলার্জির সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তা পরিহার করে চললেই সহজ উপায়ে এলার্জি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ওষুধ প্রয়োগ : এলার্জি ভেদে ওষুধ প্রয়োগ করে এলার্জি উপশম অনেকটা পাওয়া যায়।
- এলার্জি ভ্যাকসিন বা ইমুনোথেরাপি : এলার্জি দ্রব্যাদি থেকে এড়িয়ে চলা ও ওষুধের পাশাপাশি ভ্যাকসিনও এলার্জিজনিত রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বস্বাস্থ্য এ ভ্যাকসিন পদ্ধতির চিকিৎসাকে এলার্জিজনিত রোগের অন্যতম চিকিৎসা বলে অভিহিত করে।

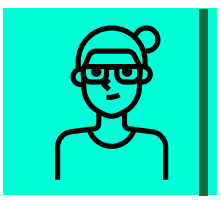

ডাঃ রোখসানা আফরোজ
সহকারী অধ্যাপক (ফিজিওলজী)
বিক্রমপুর ভূইয়া মেডিকেল কলেজ

ডিজেনারেশন

ডিজেনারেশন-বয়স বাড়ার সাথে সাথে জোড়া বা অস্থিসন্ধির বয়স বাড়ে। মেয়েদের ২৭ বছর ছেলেদের ৩২ বছর বয়স থেকে এই পরিবর্তন শুরু হয়। বয়স বাড়লে যেমন চুল পাকে, হাড়েরও তেমন বয়স হয়। হাড়ের জোড়া বা অস্থিসন্ধিরও বয়স বাড়ে।

কোথাও হাড়ের আকার পরিবর্তন হয়, মাংসপেশি বা লিগামেন্টে চাপ দিলে বা খোঁচা দিলে ব্যথা লাগে। মেরুদন্ডে এ রকম হলে আমরা বলি ঘাড়ে (সার্ভাইকাল) বা মাজায় (লাম্বার) স্পনডাইলোসিস হয়েছে। হাঁটু, কোমর বা গোড়ালিতে হলে বলি অস্টিওআর্থ্রাইটিস। কিন্তু এরকম সমস্যার সমাধান তো আপনার নিজের কাছেই আছে। আপনাকে/আমাকে চলাচলের মাঝে থাকতে হবে যতদূর সম্ভব। এতে হাড় যেমন ভালো থাকবে, মাংসপেশি দুর্বল হবে না, রক্ত চলাচলও বাড়বে।

যে কাজগুলো করা ঠিক হবে নাঃ-

- হাঁটু ব্যথার জন্য হাঁটু ভাজ করে কিছু করা ঠিক হবে না
- হাইকমোড ব্যবহার
- সিঁড়ি ভাঙ্গা এড়িয়ে চলা

যে কাজগুলো করতে হবে ঃ-

- সমতল ভূমিতে হাঁটা চলার অভ্যাস
- শরীরের ওজন কমানো
- লো ইমপ্যাক্ট এক্সারসাইজ- যেমনঃ- হাঁটা, সাতার, যোগব্যয়াম করতে হবে
- সারাদিন একই ভঙ্গিতে বসে না থাকা। যেমনঃ- টিভি বা কম্পিউটারে সামনে,পড়ার টেবিলে, টিভি দেখা বা কম্পিউটারের কাজ করার ফাঁকে ফাকে হাঁটা চলার অভ্যাস করতে হবে।

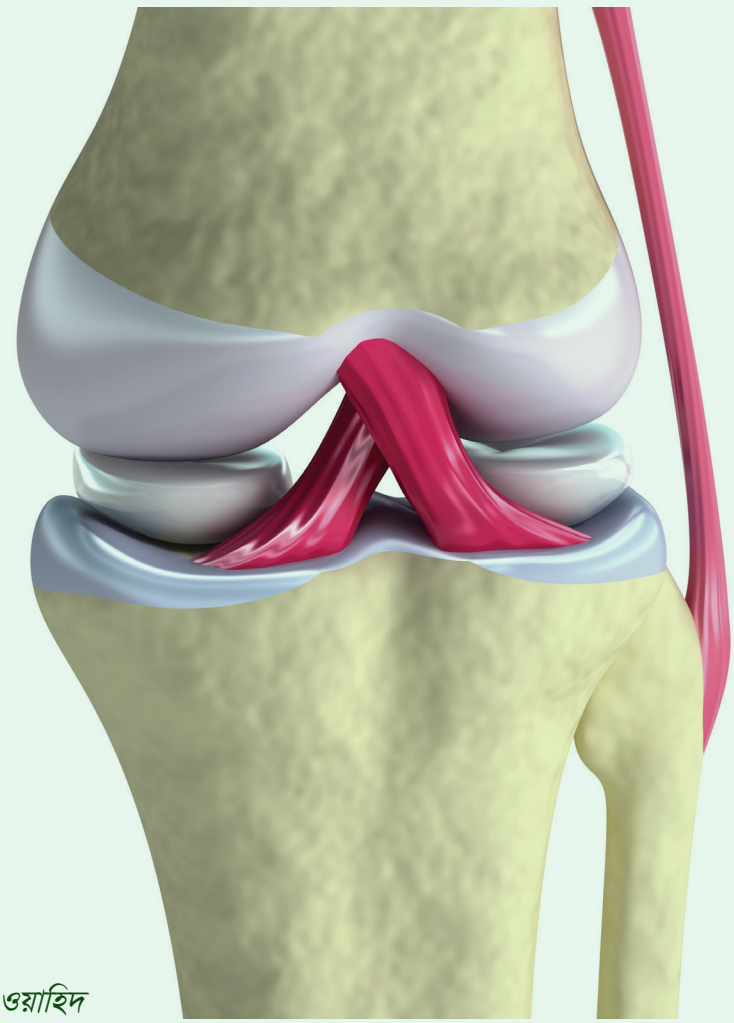

---আইভি খান ওয়াহিদ

ঘরোয়া চিকিৎসা

বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে এই উদাহরণ গুলো নেয়া হয়েছে। হয়তো আপনার এলাকায়ও এগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রচলিত আছে। আপনার এলাকায় কোন্ কোন্ বিশ্বাসে স্বাস্থ্যের উপকার হয় আর কোন্টায় হয় না, তা জানবার উপায়ের কথা ভেবে দেখুন।

পেটের আলসার (ঘা) আর বুক জ্বালা হলে, তার করণীয় কি?

১। যাদের পেটে আলসার আছে বা বুক জ্বালার রোগ আছে বেশি ঝালমশলা, খুব গরম পানীয় খাওয়া উচিত নয়। তামাক একেবারেই চলবে না। বেশি মদ খাওয়াও নয়
২। খানিকটা ভাত জলে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন। সকাল বেলা ভিজে ভাতে ২ চা চামচ মেথি মিশিয়ে খালি পেটে খেয়ে নিন।
৩। প্রতি সকালে টাটকা চালকুমড়োর রস খেলে পেট জ্বালা কমে।
৪। থোড়ের রস জলে মিশিয়ে দিনে ৩বার খান। এই রস এলকালাইন বলে পেটের এসিডের কাজ কমিয়ে দেয়।
৫। প্রতিবার খাবার শেষে একটি পাকা কলা খাবেন।
৬। খাওয়ার অনেকক্ষণ পর ঠাণ্ডা জল বেশ খানিকটা খেয়ে নিলে ব্যথা কম থাকবে।
৭। পেটের আলসার আর অম্বলের রোগে ঘৃতকুমারী কাজে লাগতে পারে। স্পঞ্জের মতো পাতাগুলি ছোট ছোট টুকরোয় কেটে ফেলুন। সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ল্যালপেলে কষা পানিটা ২ ঘন্টা অন্তর ১ গ্লাস করে খান।
৮। দুধ বা দই মেশানো ভাতে লঙ্কা বা মশলা না দিয়ে খাওয়া খুব ভালো। খাওয়ার পরে বা দুবার খাওয়ার মাঝে ব্যথা হলে ঠাণ্ডা দুধ বা ঠাণ্ডা পানি খেলে ব্যথা কমে।

বিছে কামড় দিলে, তার করণীয় কি?

১। এক টুকরো পেঁয়াজ কেটে কামড়ের জায়গায় ঘসে দিন। এতে ব্যথা কমে।
২। এক চিমটি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর এক চিমটি সাইট্রিক এসিড একসঙ্গে গুঁড়িয়ে নিন। (সাইট্রিক এসিড না পেলে ১ ফোঁটা পাতিলেবুর রস নেবেন। গুড়োটা একটা কাগজের টুকরোয় নিয়ে আস্তে আস্তে কামড়ের ঠিক ওপরে দিন। এক ফোঁটা জল দিয়ে দিন। ওষুধটা জোর বুড়বুড়ি কাটবে, আর খুব গরম হয়ে যাবে। এতে সাধারণত ঃ ব্যথা তখনকার মতো পুরোপুরি বা অনেকটা চলে যায়।
নরম চামড়া বেশি পুড়ে যেতে পারে বা ফোসকা হয়ে যেতে পারে। শুধু কামড়ের জায়গাটুকুতেই গুঁড়োটা দেবেন।
৩। বকুলবীজ ঘষে বা গাঁদা ফুলের পাতা বেটে কামড়ের জায়গায় লাগান।

হাই ব্লাড প্রেশার - রক্তের চাপ বাড়ার প্রতিকার ঃ

১। হলদে ডাটার রস ১ চা চামচ খাবার পরে খাবেন।
২। আদার রস ১ চা চামচ, মধু ১ চা চামচ আর জিরে গুড়ো ১ চা চামচ মিশিয়ে দিনে একবার করে খান।
৩। রক্তের চাপ কমানোর জন্যে দই, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন আর হলুদ গুঁড়ো খুব ভালো
৪। বেশি নুন এবং চর্বি খাবেন না।

ডায়াবেটিস - বহুমূত্র রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়ার উপায় ঃ

১। বেগুনি ফুলওয়ালা নয়নতারা (পেরিউইঙ্কল)। পুরো গাছটা শিকড় সমেত পানিতে ফুটিয়ে নিন। অন্য কিছু খাবার আগে এটা ছেঁকে খেয়ে ফেলুন।
২। জামের বিচি শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। ১ চামচ গুঁড়োর ওপর গরম পানি ঢেলে ছেঁকে পানিটা খেয়ে নিন।
৩। রোজ দু বেলা ১ থেকে ৩ চা চামচ উচ্ছে বা করলার রস খাবেন।
৪। মেথি একটু সেঁকে নিয়ে রোজ সকালে ১ চা চামচ নিমপাতার রস খাবেন।
৫। একটা লজ্জাবতীলতা শিকড় শুদ্ধ উপড়ে তুলে নিন। বেটে নিন বা চালের সঙ্গে সেদ্ধ করে কাঁজি বানিয়ে নিন। রোজ এটা খাবেন।

থ্রেডওয়ার্ম - সুতোকৃমি থেকে প্রতিকার পাওয়ার উপায় ঃ

১। নিমপাতা খুব মিহি করে বেটে নিন। এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই নিমপাতা বাটার একটি করে গুলিয়ে খাবেন। পরের ১ সপ্তাহ এটা খাবেন না। সুতোকৃমি পুরোপুরি সারাতে হলে বাড়ির সকলের একসঙ্গে এই চিকিৎসা করা উচিত।
২। ২-৪ কোয়া রসুন বেটে এক গ্লাস পানির সাথে রোজ ১ গ্লাস খান ৩ সপ্তাহ ধরে। ছোটদের দেবেন না।

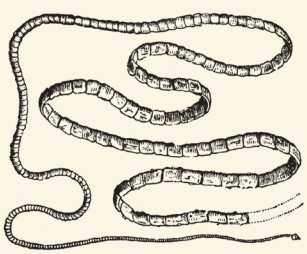

টেপওয়ার্ম - ফিতেকৃমি থেকে প্রতিকার পাওয়ার উপায় ঃ

১। ছোট এক গ্লাস দুধের সঙ্গে একটি সুপুরি বেটে নিন। ভোরবেলা খালি পেটে এটি খাবেন। ছোটদের দেবেন না।
২। একমুঠো চালকুমড়োর বিচি গুড়ো করে নিন। সকালে খালিপেটে এটি খাবেন। ২ ঘণ্টা পর ২ চা চামচ রেড়ির তেল খেয়ে নেবেন। ছোটদের দেবেন না।
৩। ছোট্ট এক টুকরো হিং জলে গুলে খালি পেটে খাবেন। সব রকম কৃমিতে কাঁচা হলুদের রসে একটু নুন মিশিয়ে ৪ চা চামচ করে কালমেঘ পাতার রস খাবেন। চিরতা ভিজানো জল একদিন অন্তর সকালে খালি পেটে খাবেন।

(ডেভিড ওয়ার্নার এর "যেখানে ডাক্তার নেই" হতে সংকলিত)

অটিজম

অটিজম একপ্রকার স্নায়ুর বিকাশজনিত সমস্যা যাতে শিশুর সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে শিশু বারবার একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং আচরণগত সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। অভিভাবকরা সাধারণত শিশুর জন্মের দু'বছরের মাঝে এই অস্বাভাবিকতা ধরতে পারেন। এর উপসর্গসমূহ প্রায়ই খুব ধীরে প্রকাশ পায়। অনেক সময় শিশুর পূর্ণ বিকাশ হয়ে যাওয়ার পর এ সমস্যা দেখা যেতে পারে। গবেষকদের মতে এটি প্রধানত বংশগত। তবে পরিবেশগত প্রভাবকও এ রোগের কারণ হিসেবে বিবেচিত। জন্মগত ত্রুটির কারণেও এ সমস্যা হতে পারে। যদিও এ রোগের কোন নিশ্চিত প্রতিকার নেই তবু তাড়াতাড়ি এ রোগ নির্ণয় করে দ্রুত স্পিচ ও বিহেভিয়েরাল থেরাপি দেয়া সম্ভব হলে তা শিশুর বিকাশে অনেক উপকার করে।

মেয়েশিশুর থেকে ছেলেশিশুরা প্রায় ৪/৫ গুন বেশী এতে আক্রান্ত হয়। ২০১৩ সালের হিসেবে বিশ্বে প্রায় ২১.৭ মিলিয়ন শিশু অটিজমে আক্রান্ত যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অটিজমের লক্ষণ

অটিস্টিক শিশু দেখতে একদম স্বাভাবিক শিশুর মতো। তাদের কোন সুস্পষ্ট শারীরিক বা স্নায়বিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এ কারণেই প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ নির্ণয় করা কঠিন। শিশু যখন স্কুলে যায় তখন এটা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। যখন অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে মিশতে পারে না, তাদের মতো আচরণ করে না তখন তার মানসিক অনগ্রসরতা ধরা পড়ে।

অটিজমের প্রধান উপসর্গই হল মানসিক বিকাশের বিলম্ব বা অস্বাভাবিকতা। জন্মের প্রথম তিন বছরের মধ্যে সাধারণত নিম্নের লক্ষণ সমূহ দেখা যায়ঃ-

- সামাজিকতা বা অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অক্ষমতা

১. কারো দিকে চোখে চোখে তাকায় না। অর্থাৎ আই কনটাক্ট করে না। বরং কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

২. নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় না। কারো কাছে আসে না। আশেপাশের লোকজনের প্রতি আগ্রহ দেখায় না। ঘরে কেউ আছে কি নেই, কে আসলো, কে কী করছে সেদিকে কোন আগ্রহ থাকে না। একাকী স্থানে সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন অবস্থায় থাকে।

৩. অর্থপূর্ণ সামাজিক হাসি হাসতে পারে না। অর্থহীনভাবে হাসে। সঠিকভাবে আবেগ প্রকাশ করতে পারে না।

৪. কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে পারে না। কেবল নিজের পছন্দের জিনিসে, অর্থহীন বিষয়ে মনোযোগ থাকে।

৫. সমবয়সী বা ছোট বড় কারো সাথেই মিশতে পারে না। নিজস্ব একটা জগতে সবসময় একাই থাকে। কোন ধরণের সামাজিক আদান-প্রদান ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না।

৬. কোনরুপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে না। অন্যের সাথে আনন্দ-অনুভূতি উপভোগ করতে পারে না।

- বয়সানুসারে ভাষাগত অক্ষমতা ঃ

১. কোন কথা বলতে বা বুঝতে পারে না।
২. অনেকে কথা বলতে পারলেও কোন প্রশ্ন উত্তর দেয় না। অনেকে যন্ত্রের মতো কথা বলে।
৩. অনেকে অপর জনের কথা পুনরাবৃত্তি করে। একই কথা বারবার বলে। অর্থহীন কথা বা শব্দ বারবার বলতে থাকে।

- বিকাশের ধারা অনুযায়ী সিম্বলিক বা কাল্পনিক খেলার অক্ষমতা

১. খেলা বা খেলনার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। আনমনে একা একাই খেলা করে। খালি বোতল,বোতাম, সুতো, তার, প্যাকেট নিয়ে অর্থহীন দীর্ঘসময় ব্যয় করে। কোন জিনিস দিয়ে দীর্ঘক্ষণ একটা কিছু তৈরী করে এরপর তা নষ্ট করে, আবার তৈরী করে। একাই হাসে।
২. যে কোন খেলনার কোন নির্দিষ্ট অংশ যেমন গাড়ির চাকা নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকে। কোন খেলনা সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না।
৩. নিজে উদ্যোগী হয়ে অন্য শিশুদের সাথে খেলতে যায় না। এমনকি অন্য শিশু আগ্রহী হলেও সে সাড়া দেয় না।
৪. কল্পনাপ্রসূত কোন কাজ বা খেলা সে পছন্দ করে না। যেমন একটি পুতুলকে শিশুর মতো আদর করা বা একটি কাঠের টুকরোকে গাড়ি মনে করে চালানো বা খেলনা পাতিলে রান্না করা ইত্যাদি করতে পারে না।

- নেগেটিভ স্টেরিও টাইপ আচরণ

১. বারবার যেমন একই কাজ করে, এমনি অন্যদেরও বারবার একই কাজ করতে জোরাজুরি করে ।
২. পরিবেশের কোন পরিবর্তন সে মেনে নিতে চায় না। একই খাবার,একই জামা,একই পরিবেশ না হলে বিরক্ত হয় বা রেগে যায়।
৩. মুখে অদ্ভুত শব্দ করে বা একই অঙ্গভঙ্গি বারবার করে। অন্যমনস্ক হয়ে নিজের হাত বা আঙুল নিয়ে নিবিষ্টমনে নাড়াচাড়া করে। চোখের সামনে এনে দেখে,আবার নাড়ায়।

- অটিস্টিক শিশুকে অনেকসময় শান্ত ও ভদ্র শিশু মনে করা হয় কারণ তারা কোন কিছু খাওয়ার জন্য, প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য স্বাভাবিক শিশুর মতো বায়না করে না। সে অন্যের হাত ধরে এনে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দিকে দেখিয়ে দেয়। নিজ হাতের আঙুল দিয়ে কিছু দেখায় না।

- মা-বাবার আদর সে প্রত্যাখান করে, স্নেহ এড়িয়ে

যায়। তাকে কোলে নিতে চাইলে সে আগ্রহী হয় না। কেউ তাকে স্পর্শ করলে সে খুব বিরক্তবোধ করে।

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশু তার মা-বাবাকে চিনে না। নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা বলতে তার কিছু থাকে না। এরা কারো সাথেই সদ্ভাব তৈরী করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে তিনমাস বয়সেই শিশু তার মাকে চিনতে পারে। কিন্তু অটিস্টিক শিশু তা করতে পারে না।

- এই শিশুরা এতো বেশি সংবেদনহীন থাকে যে অনেকে তাদের বধির বা শ্রবণপ্রতিবন্ধী বলে ভুল করে। শিশুর পঞ্চইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রিয়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না।

- জড়বস্তু বা মানুষের মাঝে তারা কোন পার্থক্য বোঝে না। পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার কোন আকর্ষণ নেই। তারা মানুষ থেকে প্রাণহীন যে কোন কিছুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যেমন-চাবির গোছা,বাক্স,তার,ঝুড়ি,সুইচ,কাপড় বা যন্ত্রপাতি। প্রাণহীন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে এবং তার সাথে সম্পর্ক তৈরীতে ব্যস্ত থাকে। অথচ মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরীতে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হয় না।

- ঘরের সাধারণ খাবার সে খেতে চায় না। কিন্তু রিচ ফুড, জাঙ্ক ফুড,কেক,পেস্ট্রি,চকোলেট,আইসক্রিম ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ থাকে।

- ধৈর্য্য ও মনোযোগ অনেক কম। তাই এদের কিছু শেখানো খুব কঠিন। এরা সহজে কিছু শিখতে পারে না। এদের মনোযোগ আকর্ষণ করাটাই অনেক কঠিন। অনেক সময় নিয়ে, ধৈর্য ধরে শেখাতে গেলেও খুব উপকার হয় না। ফলে মা-বাবা হতাশ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত কোন কাজ এরা নিজেরা করতে পারে না।

- এসব ছাড়াও আরও অনেক উপসর্গ হতে পারে। তবে সব শিশুর মধ্যে সব লক্ষণ দেখা যায় না। সাধারণত জন্মের তিন বছরের মধ্যেই এসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ধরনের যে কোন লক্ষণ দেখা গেলে দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- আ. স. ম. ওয়াহিদুজ্জামান -এর 'সুখী ও সুস্থ গৃহ' হতে সংকলিত

ফুসফুস ভালো রাখার ব্যায়াম

নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুসকে সুস্থ রাখে। বিশেষ করে হাঁপানি বা ক্রনিক ব্রংকাইটিসের রোগীদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াতে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম উপকারী। এরকম কয়েকটা ব্যায়াম সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলোঃ-

৪-৭-৮ রিলাক্সিং ব্রিদিং

পিঠ সোজা রেখে আরাম করে বসুন। 'হুস' আওয়াজ করে মুখ দিয়ে ফুসফুসের সবটুকু বাতাস বের করে দিন। এবার চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে নাক দিয়ে ১ থেকে ৪ পর্যন্ত গুনতে গভীর শ্বাস নিন। সেটা ভেতরে আটকে রাখুন। মনে মনে ৭ পর্যন্ত গুনুন। এবার ঠোঁট গোল করে আবার 'হুস' করে পুরোটা বাতাস বের করে দিন ৮ পর্যন্ত গুনতে গুনতে। কয়েক সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে পর পর চার বার এভাবে শ্বাস নিন। এই ব্যায়াম দিনে দু'বার করা ভালো। এতে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক চাপ কমে। ঘুমও ভালো হয়।

শ্বাস গোনার ব্যায়াম

মেরুদন্ড সোজা করে বসুন। চোখ বন্ধ করে পর পর কয়েকবার গভীর শ্বাস প্রশ্বাস নিন। ধীরে ধীরে এর গতি কমে আসবে। প্রথমে প্রশ্বাস ছাড়ার সময় এক গুনবেন, তার পরের বার দুই, এভাবে পাঁচ পর্যন্ত। তারপর আবার নতুন করে এক দিয়ে শুরু করুন। এই ব্যায়ামটি দিনে ১০ মিনিট করবেন। এটি এক ধরনের মেডিটেশন বা ধ্যান। মানসিক চাপ কমায়।

বেলো ব্রিদিং

মুখ বন্ধ করে চটপট নাক দিয়ে ঘনঘন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যায়াম এটি। প্রতি সেকেন্ডে তিনবার শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার চেষ্টা করুন। তারপর কিছুক্ষণ স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নিন। ১৫ সেকেন্ডের বেশি নয়। এটি যোগব্যায়ামের একটি কৌশল। এতে ক্লান্তি ঝরে যায় এবং কর্মস্পৃহা ও উৎসাহ বাড়ে।

---আইভি খান ওয়াহিদ

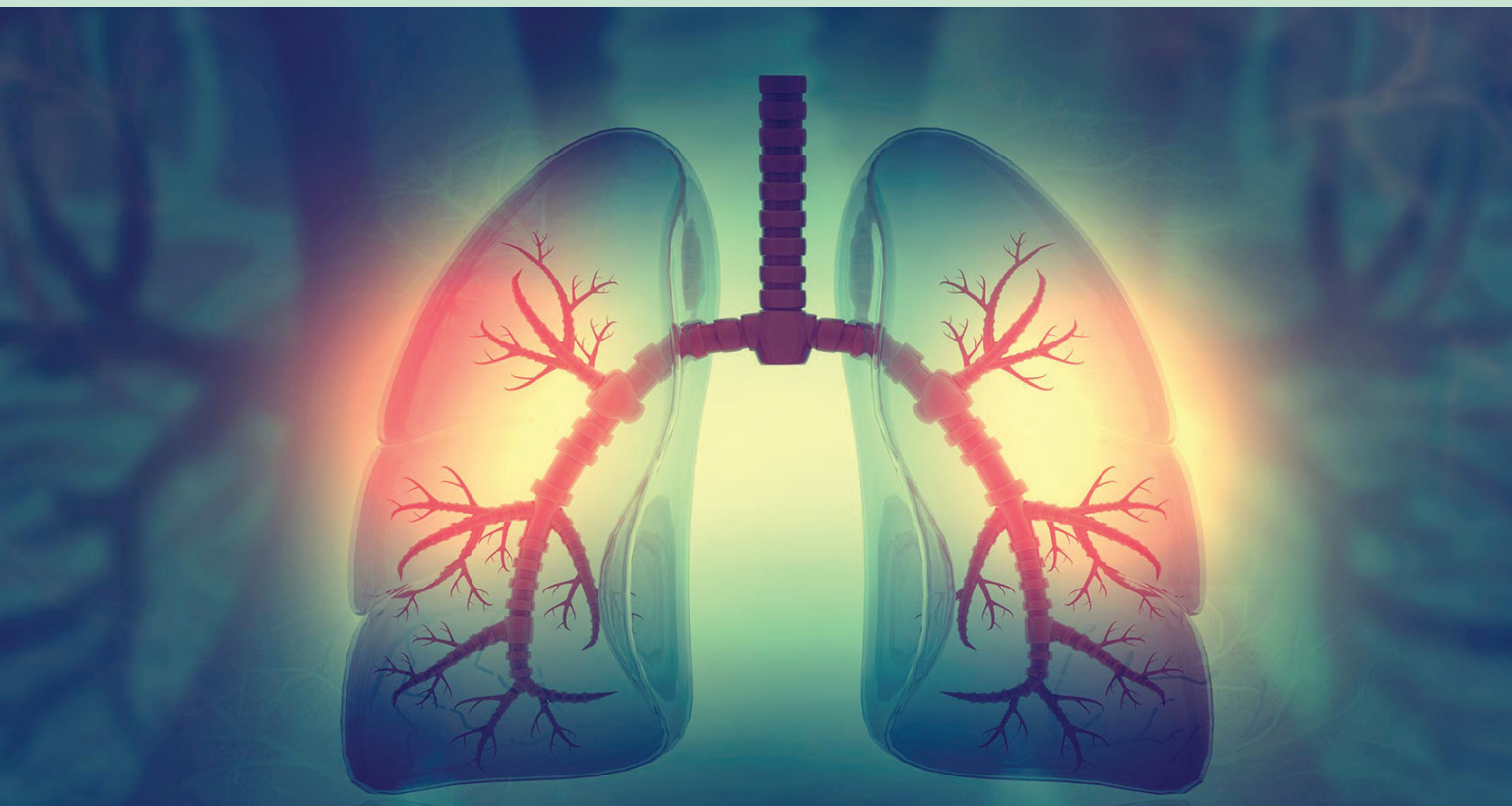

কৃমি থেকে শিশুর সুরক্ষা

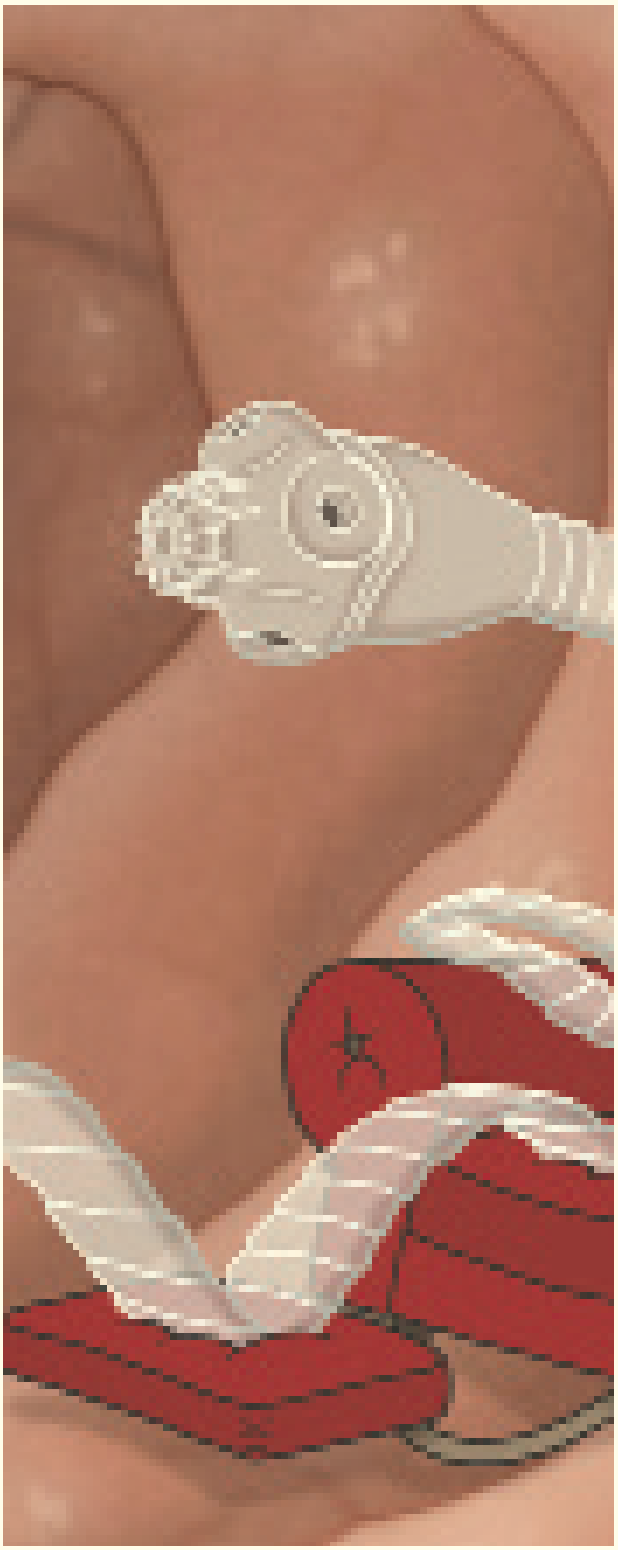

কৃমি এক ধরনের পরজীবী ; যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও খাদ্যাভাসের কারণে শিশুদের আক্রমণ করে। কৃমি হলে শিশুদের-

- খাবারের রুচি কমে যায়
- স্বাস্থ্য খারাপ হয়, ওজন বাড়ে না, কেননা সে যা খায়, তার এক তৃতীয়াংশই কৃমি খেয়ে ফেলে
- শিশু রক্তশূণ্যতায় আক্রান্ত হয়। একটি কৃমি প্রতিদিন শরীর থেকে শুন্য দশমিক ১ মিলিলিটার রক্ত শোষণ করে থাকে। কৃমির কারণে আমাদের দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ শিশু রক্তশূণ্যতায় ভুগছে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঃ

- যে কোনো কিছু খাওয়ার আগে শিশুকে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। এই অভ্যাস শিশুর মধ্যে তৈরি করুন।
- টয়লেট ব্যবহারের আগে এবং পরে অবশ্যই এ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করাতে হবে।
- পানি ভালো করে ফুটিয়ে পান করাবেন। সম্ভব হলে শিশুর তৈজসপত্র ফুটানো পানি দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার শিশুকে খাওয়াবেন না।
- স্বাস্থ্যকর উপায়ে পরিষ্কার হাতে শিশুর খাবার তৈরি ও পরিবেশন করবেন এবং খাবার ঢেকে রাখবেন।
- নোংরা জায়গায় শিশুকে খালি পায়ে হাঁটাবেন না।
- দুই বছর বয়স থেকে প্রতি ছয় মাস পর পর শিশুকে কৃমির ওষুধ খাওয়ান। বাড়ির গৃহকর্মীসহ পরিবারের সবাই এই ওষুধ খাবেন।

---আইভি খান ওয়াহিদ

মাথা ব্যথা

মাথাব্যথা আমাদের প্রায়ই হয়। তবে বেশিরভাগ মাথাব্যথা কোন বিপদজনক নয়। ৯০ শতাংশ রোগীর মাথাব্যথার কারণ মাইগ্রেন এবং উদ্বেগজনিত।

সাধারণত কৈশোর ও যৌবনে মানুষ মাইগ্রেনে আক্রান্ত হয়। এই মাথাব্যথা মাঝারি থেকে মারাত্মক হতে পারে। ব্যথা শুরুর আগে চোখের সামনে আলোর ঝলকানি হতে পারে, সঙ্গে বমিও। এই ব্যথা দুই ঘন্টা থেকে দুই দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। মাথার এক পাশে হয় বলে এই ব্যথার আরেক নাম আধকপালি মাথাব্যথা।

এছাড়া মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, টিউমার,মেনিনজাইটিস, মাথায় পানি জমা এবং মস্তিষ্কের বাইরে আরও সমস্যার (যেমন সাইনুসাইটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যা, কানের ব্যথা, কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়া) কারণে মাথাব্যথা হতে পারে।

নিম্নোক্ত খাবারগুলো মাথাব্যথা বাড়াতে পারে ঃ-

- আইসক্রিম
- চকোলেট
- পাকা কলা ইত্যাদি

নিম্নোক্ত অভ্যাসগুলো মাথাব্যথার কারণ হতে পারে ঃ-

- রাত জাগা
- একনাগাড়ে অনেকক্ষণ টেলিভিশন দেখা
- ভিডিও গেম বা মোবাইল গেম খেলা
- কম্পিউটার নিয়ে অতিরিক্ত সময় কাটানো ইত্যাদি।

---আইভি খান ওয়াহিদ

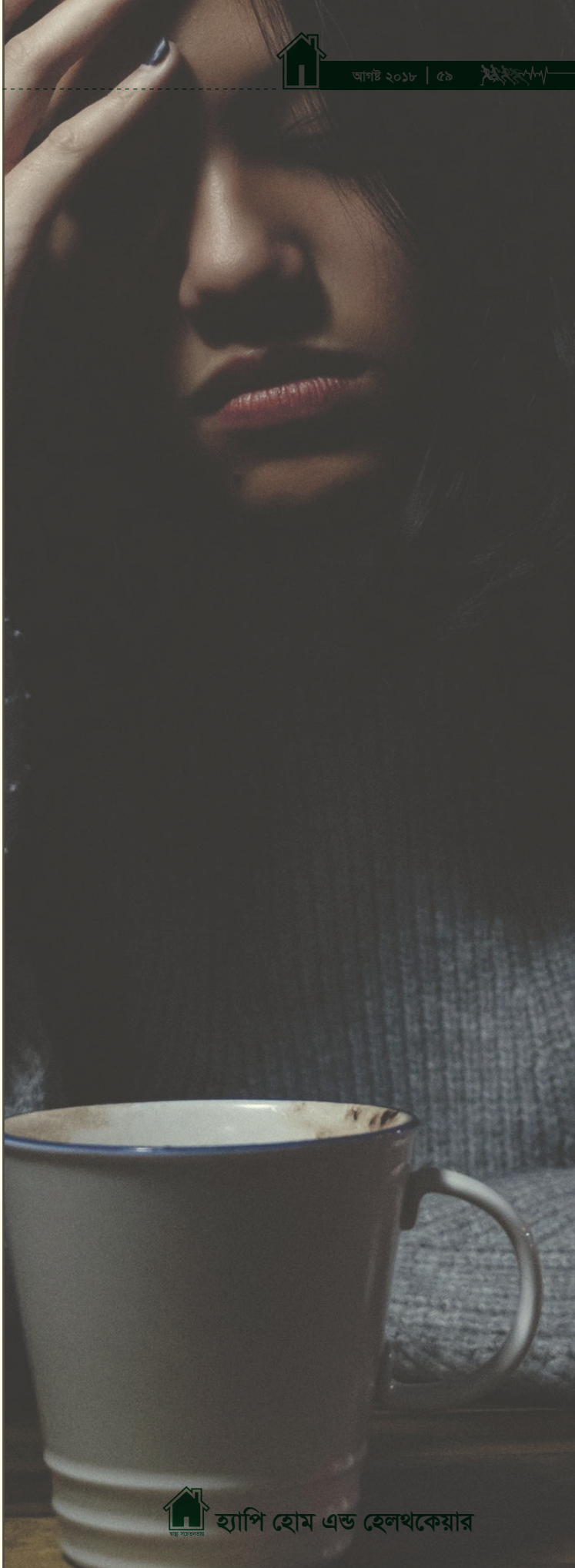

বন্ধুত্ব সুস্থ জীবনের জন্য

হৃদযন্ত্রের সুস্থতার উপর বন্ধুত্বের প্রভাব রয়েছে। সুইডেনের একদল গবেষক ১৩ হাজার ৬০০ জনের উপর তিন বছর গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান, যাদের বন্ধু বান্ধব কম বা নেই, তাদের ক্ষেত্রে হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৫০ শতাংশের বেশি। নিউইয়র্কের গবেষকরাও এ বছর প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন, বন্ধুহীন ব্যক্তিরা হৃদরোগ,উদ্বেগজনিত রোগ ও বিষণ্নতায় বেশি ভোগে।

২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব দ্য ন্যাশনাল মেডিকেল এসোসিয়েশন-এ বলা হয়েছে, ভালো বন্ধুত্ব মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এই মানসিক চাপের সঙ্গে সম্পর্ক আছে হৃদরোগের। মানসিক চাপের ফলে রক্তনালির ভেতর প্রদাহের ঝুঁকি বাড়ে, যা পরবর্তী সময়ে রক্তের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত করতে পারে; নালির ভেতর রক্ত জমে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

পিটসবার্গের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক শেলডন কোহেল বলেন, জীবনের কষ্টকর সময়গুলো মোকাবিলা করতে বন্ধু সহায়তা করে। তারা চাপ মোকাবিলার জন্য মানসিক অবলম্বন হিসেবে দুঃসময়ে পাশে থাকে।

যাদের সামাজিক যোগাযোগ বেশি, তারা অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হয়, এবং জীবন ও পরিবেশের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ অনুভব করে। বন্ধুত্ব স্বাস্থ্যকর জীবনাচরণকেও উৎসাহিত করে। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, সুখ সংক্রামক।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা বলেছেন, সুখ ব্যাপারটি সংক্রামক ভাইরাসের মতোই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে একজনের কাছ থেকে অন্যজনে ছড়ায়, সুতরাং আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি সুখী হয়, সে ক্ষেত্রে আপনারও সুখী হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। অপরদিকে

> “
>
> মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা বা অভিব্যক্তিবাদেই রয়েছে এর উত্তর। মানুষ সামাজিক জীব। তাদের জন্মই হয়েছে সমাজবদ্ধ হিসেবে বাস করার জন্য। আর তাই সামাজিক বন্ধন দৃঢ় এমন ব্যক্তিরা অন্যদের চেয়ে বেশি মানসিক প্রশান্তি অনুভব করে, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। ফলে তাদের হৃদরোগ কম হয়, রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বেশি থাকে এবং চাপ সঞ্চারী হরমোন কার্টিসলের পরিমাণ দেহে কম থাকে।
>
> *--তাশা আর হার্ডই*
> *মনোবিজ্ঞানী*
> *হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের*

সমাজবিচ্ছিন্ন, বান্ধবহীন জীবন একই সঙ্গে অসুস্থ ও অসুখীও।

বয়সী একাকী ব্যক্তিরা উচ্চ রক্তচাপ ও নিদ্রাহীনতায় বেশি ভোগেন। অস্থিরতা ও উদ্বেগে আক্রান্ত হন। তাদের দেহে স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেশি থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কম। হার্ট অ্যাটাকের পর দ্রুত মৃত্যুর ঝুঁকি তাদের ক্ষেত্রে বেশি।

শিকাগোর রাশ ইউনির্ভাসিটি মেডিকেল সেন্টারের গবেষকরা দেখেছেন, একাকিত্বে ভোগা ব্যক্তিদের স্মৃতিভ্রংশ রোগ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুন। ২০০৬ সালে স্তন ক্যান্সারের আক্রান্ত তিন হাজার সেবিকার ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, ঘনিষ্ট বন্ধুহীন রোগীদের ক্যান্সারে মারা যাওয়ার ঝুঁকি, যাদের দশের অধিক বন্ধু আছে, তাদের চেয়ে চার গুণ বেশি।

একই ভাবে, জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের উপর চালানো অন্য গবেষণায় প্রায় একই ধরণের ফল পাওয়া গেছে।বন্ধুত্বের যেসব উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেগুলো ভালো বন্ধুত্বের ফল। বিপদগামী বন্ধুরা অবশ্যই আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও বড় হুমকি।

যারা অনিয়ন্ত্রিত ও অসুস্থ জীবনধারণে অভ্যস্থ তারা আপনাকেও স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপনের পথে নিয়ে যেতে পারে। আপনি হয়ে পড়তে পারেন ধূমপায়ী, মাদকাসক্ত, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ। তাই সুস্থ, দীর্ঘ জীবনের জন্য খুঁজে নিন প্রাণবন্ত, সুখী, পরোপকারী, বিশ্বস্ত, ভালো বন্ধু, গড়ে তুলুন নির্মল বন্ধুত্ব।

---সংকলিত

রান্নার সহবত

বহুকাল আগে থেকে এ বাংলা ভাষাভাষী আঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার রান্নার প্রচলন । একই খাবারের ভিন্ন ভিন্ন রান্না, মশলার ব্যবহার এবং পরিবেশন খাবারে আনে বৈচিত্র্য । কম বেশি সব পরিবারেই খাবার তৈরির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তবে বর্তমানে এই মিডিয়া নির্ভর আধুনিক যুগে খুব সহজেই দেশি বিদেশী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক রান্নার কদর, বাড়ছে ভিন্নতা। তবে রান্না যে দেশের বা যে অঞ্চলের হোক না কেন রান্নাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রান্নার উপর নির্ভর করে সুস্বাস্থ্য। তাই রান্নার কিছু সহবত সবসময় মেনে চলা উচিৎ। তা কেমন? রান্নার সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিষ্কার-পরিছন্নতা। এক্ষেত্রে রাঁধুনি, রান্না ঘর , রান্নার সরঞ্জাম, রান্নার উপকরণ এবং ব্যবহার এর পানি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমেই আসি রাঁধুনির প্রসঙ্গে, রাঁধুনি বা যিনি রান্না করবেন তার সুস্থতা খুবই জরুরী। কোন রকম সংক্রামক ব্যধি, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস ইত্যাদি অসুখে খাবার তৈরির কাজ না করাই ভাল। এছাড়া খাবার তৈরির সময় চুল ভাল ভাবে বাধা থাকতে হবে এবং নখ অবশ্যই যেন ছোট করে কাটা থাকে এতে করে কিছুটা হলেও রোগ সংক্রমণ কম হবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের হাতের অলঙ্কার পরিষ্কার পরিছন্নতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তাই রান্নার সময় হাতের অলঙ্কার না পরাই ভাল। রান্না ঘর এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা দিনের বেশ কিছুটা সময় কাটাই তাই রান্নাঘর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিজ্ঞান সম্মত হওয়া খুব জরুরী । আধুনিক যুগে রান্নাঘর সাধারণত নানা রকম রান্নার সরঞ্জাম, ওভেন, চিমনী, কেবিনেট ইত্যাদি থাকে ।

এ সব কিছুই নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিস্কার করতে হবে তাতে করে পোকা মাকড় এর উপদ্রব কমবে এবং রোগ সংক্রমণ কম হবে। রান্নার উপকরণ অর্থাৎ চাল, ডাল, সবজি, মাছ মাংস , মসলা ইত্যাদির প্রত্যেকটার শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি সঠিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুকনা খাবার যেমন চাল,ডাল, মশলা,- এ ধরণের খাবার গুলো বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখতে হবে আর নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হবে। এ ধরনের খাবার গুলো বিশেষ করে গুড়া মশলা বাতাসে এবং তাপে নষ্ট হয়ে যায় । ইদানিং কালে plastic ব্যবহার অনেক বেড়েছে, কিন্তু খাদ্য সংরক্ষণ এর জন্য কাঁচের পাত্র সবচেয়ে ভাল, কারণ কাঁচের সাথে খাবারের রাসায়নিক বিক্রিয়া কম হয় । সবশেষে পানির কথায় আসি, আমরা খাবার সময় সবসময় ফুটানো বিশুদ্ধ পানিই খাই কিন্তু রান্নার জন্য যে পানি ব্যবহার হয় সেটা ও পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। অল্প সময় ও তাপে রান্না করা খাবার সব সময় বিশুদ্ধ পানিতে হওয়া দরকার।

খাদ্য প্রস্তুত বা রান্না এক প্রকারের বিজ্ঞান, সুতরাং সুস্থ থাকতে সুষম খাবার গ্রহন এবং রান্নার কিছু সহবত মেনে চলাই যথেষ্ট।

ওয়ালিউননেসা ইনু
চিফ কনসালটেন্ট
ডায়েট এ্যান্ড ফিট

Diet & Fit
Complete Solutions of Diet & Fitness
www.dietandfit.org

Diet & Fit is a dietary and fitness consultation center. We help you to manage a healthy diet and maintaining physical fitness for a better living.

House # 6/6, Road # 7, Block - B, Lalmatia
Dhaka - 1207.
+8801829491880, info@dietandfit.org

Indulge in

LIVING

www.navana-realestate.com

RESIDENTIAL SPACE @

- BARIDHARA
- NORTH GULSHAN
- GULSHAN
- BANANI
- NIKETON
- DHANMONDI R/A
- WEST DHANMONDI
- ELEPHANT ROAD
- UTTARA
- BASHUNDHARA
- SHAHJADPUR
- SEGUNBAGICHA
- ESKATON
- MOGHBAZAR
- MIRPUR
- KALLAYNPUR
- DHOLAIKHAL
- RAJARBAGH
- HAZI PARA
- PALTAN

DIFFERENT • DEPENDABLE • DEFINITIVE

Navana Real Estate Ltd.

Corporate Office: House: 3/A, Road: 90, Gulshan-2, Dhaka.
Tel: 58815305

16254 (Hunting)

DIFFERENT • DEPENDABLE • DEFINITIVE

নিজের অধিকার আদায় আর নিজের সম্মান রক্ষায় নিজেকেই সোচ্চার হতে হবে সেই সাথে হতে হবে আত্মবিশ্বাসী , সাহসী আর কৌশলী

--জওশন আরা রহমান

আজ আমার লেখার শব্দ ভান্ডারের বড়ই সংকট। এক অনন্যাকে জানার পরে তাকে শব্দে প্রকাশ করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় আমি বন্দী। কি করে উপস্থাপন করি তার জীবন ধারাপাতকে, যেখানে প্রতিটি ধাপ ছিল কণ্টকাকীর্ণ কিন্তু তার অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে ধীরে ধীরে পদদলিত হয়েছে সে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ। এ যেন অদম্য গতিধারা- এগিয়ে চলার, পথ তৈরী করার তেজদীপ্ততা- অনুজদের জন্য। নারী আন্দোলন নয়, নয় নারী জাগরণ -এ যেন নারীকে তার স্বরূপ চেনাবার দুর্বার অভিযান। নদীর খরস্রোতধারা যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায় সকল নুড়ি পাথর আর আবর্জনাকে, তার চলার বা এগিয়ে যাবার পথটি তেমনি খরস্রোতা, যাকে থামাতে পারেনি সমাজের কোন পংকিলতা, চিরায়ত সামাজিক অনুশাসন, পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা কিংবা পেশাগত সমস্যা। যে যুগে মুসলিম নারীদের সীমানা কেবল ঘর হতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন আর বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পড়ালেখা শেষ হবার আগেই গৃহিণী সেখানে তিনি ছিলেন উল্টো রথের যাত্রী।

ব্যক্তি জীবনে পরিবেশ আর সমাজিকতায় কিশোরী বয়সেই যখন বসতে হয়েছে বিয়ের পিঁড়িতে , বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল পড়াশুনার, তখন নিজের জন্য নিজেই এসেছেন এগিয়ে, এসেছেন সুযোগ তৈরীতে, নিজেই পরিবেশ তৈরী করছেন জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার। তখন থেকেই বিশ্বাস করতেন নিজের সমস্যা সমাধানের পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়। তাই প্রথম যুদ্ধেই জয়ী হয়ে জীবনের বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধতে পেরেছিলেন জীবন সঙ্গীকে। তাই তিনি পরিবার আর সংসার নামক কর্মচর্চাকে কোন দিন সমস্যা হিসাবে উপস্থাপন করার উপক্রম হতে দেননি। হয়েছেন অভিভাবক, হয়েছেন বন্ধু, হয়েছেন চলার সাথী এবং এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ। এ যেন তার প্রথম নারী বিজয়। সমাজ, পরিবার আর সংসারের জাল হতে আন্তরিক মুক্তিই কেবল নয় বরং এটাই হয়ে গেছে তার "পাওয়ার হাউস" বা সকল শক্তির উৎস।

এভাবেই শুরু, ব্যক্তি জীবনের সমস্যা সমাধানে যেমন নিজের ধৈর্য্য, ভালোবাসা আর অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ তৈরী করেছেন তেমনি নীতি দিয়ে, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে; সেভাবেই একের পর এক প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবেলা করে পরাস্ত করেছেন পেশাগত প্রতিবন্ধকতা আর সময় যুদ্ধকে। কি নেই সেই পথ চলায়?

স্বামীর সাথে

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান আর ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বামী ছিলেন একজন

দেশপ্রেমী, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, কবি এবং সাহিত্যিক জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী। তার লেখা বিখ্যাত কবিতা "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধায় লেখা প্রথম কবিতা। এমন সক্রিয় দেশপ্রেমীর জীবনসঙ্গী হিসাবে তিনিও জড়িয়ে ছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের সৈনিক হিসাবে, ছিলেন ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়, পেয়েছেন "মুক্তিযোদ্ধা" আর "ভাষা কন্যা" উপাধিও। কোথায় ছিলনা তার নারী মুক্তির আর নারী উন্নয়নের কর্মপ্রচেষ্টা! আর দশজন নারীর মত তিনি পারতেন পড়াশুনা শেষে ভালো চাকুরী করে মোটা অংকের টাকা কামিয়ে শান-শওকতে আরামে আয়েশে জীবন যাপন করতে।

অন্তত তার পারিবারিক বংশ মর্যাদা আর পারিবারিক ঐতিহ্য সেরকমই উচ্চতর ছিল। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার চুনতি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুনসেফ পরিবারের ইতিহাস অন্তত তাই বলে। কিন্তু তিনি সাধারণের মাঝে ছিলেন অসাধারণ। পারিবারিক শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নিজের আলোকিত অন্তরের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজ গ্রাম, নিজ শহর আর নিজ দেশের সর্বত্র। কখনও কখনও তা ছাড়িয়ে গিয়েছিল দেশের সীমানা। সকল কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যই ছিল নারী জীবনের পরিবর্তন, নারীর ভেতরে নারীত্বকে জাগিয়ে তোলার কর্ম প্রচেষ্টা,আর এগিয়ে চলা। বৃটিশ ভারত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম জাগরণ, সামাজিক বিপ্লব, মুক্তিযুদ্ধে নারী আন্দোলনের সবার রং দিয়েই আঁকা তার জীবনের ক্যানভাস, ছাত্র জীবনের কলেজ বন্ধু মুহাম্মদ ইউসুফের সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কলেজে সাময়িকী এবং "দু'পাতা" তে। পারিবারিকভাবে তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল মামা কামাল উদ্দিন আহম্মেদ খান, মামী সুফিয়া কামাল, সর্বোপরি স্বামী মাহবুব উল আলম চৌধুরী। জীবনকে দেখেছিলেন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ, মেয়েদের জন্য দেশের মানুষের জন্য কিছু একটা করার মানসিকতা ছিল তার জীবনব্রত। তাইতো কর্মজীবন শুরুই করেছিলেন সরকারী সমাজকর্মী হিসাবে। মমতা আর মানবিকতা দিয়ে দরিদ্র মানুষের সাথে মিশে তাদের হয়ে শুনেছেন তাদের সমস্যা। পেশাগত সীমাবদ্ধতায় কখনও যদি সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিজেই তৈরী করে নিতেন সমাধানের পথ।

সরকারী চাকুরী যতদিন করেছেন তিনি শিখেছেন কিভাবে নিজের অধিকার আদায় করতে হয় নারী সহকর্মী হিসাবে টিকে থাকার স্বার্থে। জানতেন কিভাবে পথ তৈরী করতে হয় শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা দিয়ে। সম্মান অর্জন করেছেন সম্মান দিয়ে। যখন কাজ করেছেন আর্ন্তজাতিক সংস্থার প্রধান হিসাবে, তখনও দলের প্রধান হয়েও কাজ করেছেন দলের একজন হিসেবে কারণ তিনি জানতেন তিনি একজন নারী আর তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়াটা তৎকালীন পুরুষসমাজের জন্য খুব স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু তিনি তার যোগ্যতা প্রমাণে কখনও পিছুপা হননি।

নারী হিসেবে যখনই কোন সমস্যায় পড়েছেন তা জয় করেছেন ধৈর্য্য, সাহসিকতা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। দাতা সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে নারী উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। বাংলাদেশে তিনি প্রথম নারী যার নেতৃত্বে দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী ও শিশুদের জন্য আলাদা করে উন্নয়নমূলক অধ্যায় সংযোজিত হয়, যার ফলাফল আজ সারা দেশের নারী ও শিশু ভোগ করছে। বর্তমানে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী অংশগ্রহণের যে প্রয়োজনীয়তা দেশ অনুভব করছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়ানোর কাজ করছে তার সূত্রপাত ছিল তাঁর সেই আন্দোলনের আর আন্তরিক চেষ্টার ফল। কর্ম জীবন শুরু ১৯৬০ সালে। ১৯৬০ হতে যুদ্ধ পরবর্তীতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন সরকারী দপ্তরে।

> *"নারী হিসাবে যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি তা জয় করেছি ধৈর্য্য, সাহসিকতা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।"*

১৯ বছর কাজ করার পর ১৯৭৯ সালে যোগদান করেন ইউনিসেফে, কাজ করেছেন ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের কর্মজীবনের ১৭টি বছর কাজ করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য। বর্ণাঢ্য এক কর্মজীবনে তিনি সরকারের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট সংযম আর ধৈর্য্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছিলেন আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত সমস্যা, অন্যদিকে ইউনিসেফের নতুন নতুন নিয়ম কানুন মেনে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব। এ সময়ে কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্য ছিল উল্লেখ করার মত। কম সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ তাকে মানসিকভাবে আহত করতো । কিন্তু যেখানেই তিনি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন সরে দাঁড়াননি পথ ছেড়ে বরং মোকাবেলায় ছিলেন প্রতিবাদী এবং সাহসী। কাজ দিয়ে প্রমাণ করেছেন নিজেকে বার বার। তার হাতেই প্রথম ফান্ড দেয়া হয় ড. মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীন ব্যাংক প্রকল্পকে। তিনি তখন ইউনিসেফের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তার বিশ্বাস ছিল কলেজ বন্ধুর উপর। দূরদর্শী এই জয়িতার জীবন কাব্য আজকাল যেকোন নারীর জন্য শিক্ষণীয় আর অনুকরণীয়।

"আমার স্বাস্থ্য" জার্নালের সুযোগ হয়েছিল এই অসাধারণ প্রজ্ঞাময় অদম্য মানুষটিকে কাছ থেকে শোনার এবং জানার। তার জীবনকাব্য যেকোন নারীর জন্য পথনির্দেশক বিশেষ করে যারা সত্যি কিছু করতে চায়, বদলাতে চায় সময়কে সবার জন্য । তাঁর অভিজ্ঞতা, কর্মময় জীবন আর অর্জন আজ দেশের গর্ব। এই অসাধারণ মানুষটির সাধারণ কিছু কথা নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন "তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী"- কলমে কালিতে ছিলেন নাজনীন নাহার।

আপনার জন্ম এবং শৈশব কোথায় কেটেছে?

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতী গ্রামে মুনসেফ বাড়ীতে জন্ম আমার, আমার দাদা সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন একজন নামকরা কাজী। প্রপিতামহ শুকুর আলী মুনসেফের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল। আমাদের বাড়ী যাবার রাস্তার নাম করা হয় তার নামে। শুকুর আলী মুনসেফ লেইন।

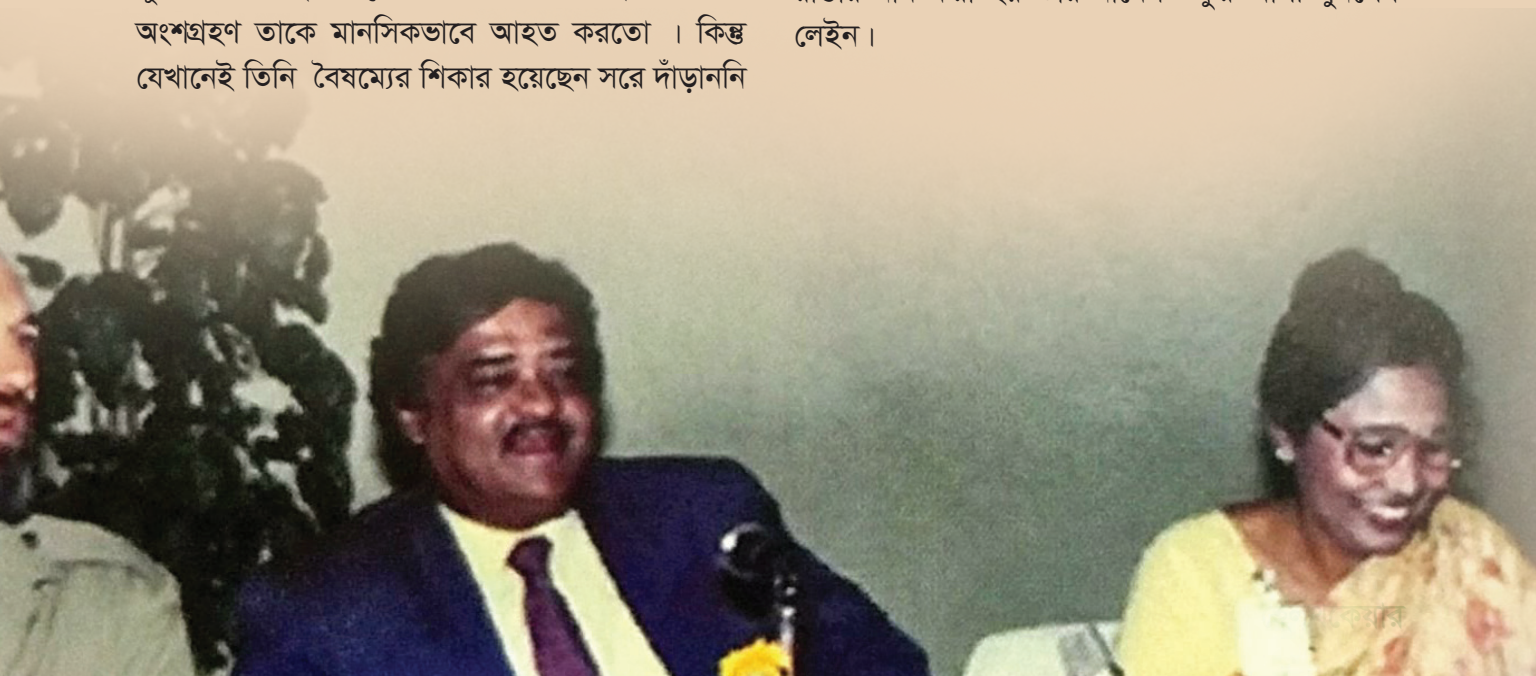

অপর দিকে আমার নানা তৈয়ব খান ছিলেন জমিদার এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আমার মায়ের দাদা ছিলেন খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন, তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাবা মাহবুবুর রহমান ছিলেন সরকারী চাকুরে। নানার দিক দাদার দিক উভয়দিক হতেই আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং পারিবারিক অনুশাসনের মাঝেই আমার বেড়ে উঠা। আব্বা ছিলেন একজন নীরব সমাজকর্মী। অনেক দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে পড়াশুনা করিয়েছেন, সে সাথে তিনি ছিলেন একজন প্রগতিশীল মানুষ তাই ছোটবেলা পড়াশুনার পাশাপাশি বইপড়া, গানশোনা, গান গাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছি বাবার কাজ হতেই।

আমার মা আমাদের পড়াশুনা, আদব কায়দা শেখানো, রান্নাবান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সময় পেলে বই পড়তেন। আমার মামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (কবি সুফিয়া কামালের স্বামী) কলকাতা হতে মায়ের জন্য পত্রপত্রিকা নিয়ে আসতেন। মা সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। মা কোনদিন কাজের লোকদের নাম ধরে ডাকতেন না। আমাদেরকে ডাকতে দিতেন না। বুবু, দিদি, আপা ইত্যাদি ভাবে সম্বোধন করা হতো তাদের। কাজের লোকেরাও মানুষ আর মানুষকে মানুষ ভাবতে পারার কাজটা মা আমাদের শিখিয়েছেন। আব্বা ভোরবেলা নামাজ পড়ে ইংরেজীতে তরজমা সহ সুর করে কুরআন পড়তেন।
বাসায় ধর্মচর্চা ছিল, তবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না । আমাদের বাবা সৎ ছিলেন। সম্পদের বিবরণে বলতেন আমাদের ৮ ভাইবোনই তার ৮ অট্টালিকা। সময় সামাজিকতায় বড় আপার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেলেও আমার বাকী ৭ সাত ভাইবোনকে বাবা মা পড়াশুনা শিখিয়েছেন। পারিবারিকভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, দেশপ্রেম, মানবতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের ইতিবাচক পরিচর্যার মাধ্যমেই আমার শৈশবে বেড়ে উঠা। ১৯৫০ সালে চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে কৃষি শিল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি ও ফেরদৌসি রহমান একসাথেই গান করেছি। তিনি তখন ছোট বালিকা। আমি ছোট বেলায় খুব জেদি আর স্পর্শকাতর ছিলাম। মা বলতেন মিলিটারি মেজাজ!

পড়াশোনার শুরুটা হয়েছিল কিভাবে?

আমার প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হয় "গুল এ জার স্কুলে"। ছোট বেলায় আমি ভীতু ছিলাম, সব সময় আমার ছোট বোনের সাথে সাথে থাকতাম। মাঝে মাঝে স্কুলে কাঁদতাম। বড় বোনের কান্না দেখে আমার ছোট বোন বিব্রত অবস্থায় পড়ে যেতো । পঞ্চম শ্রেণিতে এসে ভর্তি হলাম কুসুম কুমারী বালিকা বিদ্যালয়ে। কুসুম কুমারী আমৃত্যু এই স্কুলের প্রবীন শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এই স্কুলে তখন মুসলিম মেয়ের সংখ্যা হাতে গোনা। ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে আমি আবার "গুল এ জার স্কুলে" চলে আসি। এই সময়গুলো ছিল বেশ আনন্দের, কলকাতা হতে তখন অনেকে এসে চট্টগ্রামে পড়তো। পাকিস্তান, কলকাতা তখন সব একত্রিত ছিল। দুরত্ব ছিল কেবল রাস্তার। তাই সুযোগ হয়েছিল ভিন্ন সংস্কৃতির, ভিন্ন

ধর্মের কায়দা কানুন পালনের সংস্পর্শে আসার। সে সময় চট্রগ্রাম খাস্তগীর স্কুল ছিল নামকরা স্কুল এবং ভর্তি হওয়াও কঠিন ছিল। চরম প্রতিযোগিতা এবং আমার মেজো ভাই লুৎফর রহমানের আন্তরিক চেষ্টায় আমি খাস্তগীর বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই। এখানে মুসলিম মেয়ের সংখ্যা ছিল খুবই কম। খাস্তগীর স্কুলে দশম শ্রেণীতে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি আমরা ১৪ জন ছাত্রী। এই ১৪ জনের ১৩জনই পরবর্তীতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক হয়েছি। আমি লেখাপড়ায় অত্যন্ত সাধারণ ছিলাম।

তবে কঠোর পরিশ্রম করে মেধাকে খাটিয়ে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা আমার জীবনে বার বার অনুভব করেছি। মেট্রিক পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে স্কলারশীপ নিয়ে পাস করেছিলাম খাস্তগীর স্কুল হতে ১৯৫২ সালে। যদিও পরীক্ষার আগেই আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

তাহলে বিয়ে আর আপনার পড়াশুনার মাঝের সম্পর্কটা কিভাবে সামলেছিলেন?

মেট্রিক পরীক্ষার দু'মাস আগে আমি খাস্তগীর স্কুলের হোস্টেলে ছিলাম। বাসায় মেঝ ভাইয়ের বিয়ে, আত্নীয়স্বজনের আসা যাওয়া, বাসা ভর্তি লোকজন- তাই পড়াশোনার জন্য হোস্টেলে থাকা। হোস্টেলের জীবনটা ছিল বেশ আনন্দের,পড়াশোনার ব্যস্ততার পাশাপাশি, মেট্রনের নজরদারি। এর মাঝে হঠাৎ একদিন ছোট বোন জুবলী আমাকে নিতে এলো মেঝ ভাইয়ের আদেশে।

বাড়ী এসে রাতে খাবারের পর মেঝ ভাইয়ার রুমে ডাক পড়লো। ভাবলাম হোস্টেল হতে হয়তো বাসায় নিয়ে আসার ব্যাপারে কথা বলবে। কারণ সেখানে মাসের খরচটা কম ছিল না। কিন্তু বিষয়টি ছিল ভাবনার বাইরে। ভাইয়া জানালেন আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তিনি আমাকে বিয়ে দিতে চান। এর আগে ৮ম শ্রেণীতে থাকতে ভাইয়া তার এক ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে একবার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন বাল্য বিবাহ স্বাভাবিক, তবে আমাদের পরিবারে মেয়েদের মত না নিয়ে বিয়ে দেওয়া হতো না। ছোট বেলা হতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমার সুদৃঢ় বাসনা। বড় হবার ইচ্ছা, তাছাড়া কম বয়সে লেখাপড়া শেষ না করে আমার বিয়ে হবে এ কথা কোন দিন ভাবতে পারতাম না। বোধ করি এই দুর্বার মনোভাব নিয়ে আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলাম। লিখিতভাবে ভাইয়াকে

জওশন আরা রহমান

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জওশন আরা রহমানের কর্মময় জীবন। প্রথমে নারী-উন্নয়ন কর্মসূচি প্রধান এবং পরবর্তীতে প্রোগ্রাম- প্ল্যানিং সেকশনের প্রধান হিসেবে ইউনিসেফে সাড়ে সতেরো বছর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেন। এসব কর্মসূচিতে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। এই সুদীর্ঘ সময়ে নারী উন্নয়ন এবং শিশু অধিকার বিষয়ে তার বিভিন্ন লেখা দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয়। এর আগে তৎকালীন সমাজকল্যাণ বিভাগে সাড়ে আঠারো বছর বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম শহরে সমাজকল্যাণ অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর হিসেবে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ সমাজকল্যাণ 'মাদার্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৯ সালে ইউনিসেফে যোগদান করেন।

তিনি লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স ইত্যাদিতে যোগদানের জন্য আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার প্রায় ত্রিশটি দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯ অক্টোবর ১৯৩৬, চট্টগ্রাম জেলার তৎকালীন সাতকানিয়া থানার চুনতি গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুনসেফ পরিবারে তার জন্ম। ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম শহরের বিখ্যাত ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবার আগেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সঙ্গে। বিয়ের পর নিয়মিত লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'অন্বেষা' সম্পাদন করেন। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদের চট্টগ্রাম জেলা শাখার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে বি.এ পাস করেন। সমাজকল্যাণ বিভাগে চাকরিতে থাকাকালীন ১৯৬৪-১৯৬৫ সালে কলম্বোপ্ল্যান স্কলারশীপ নিয়ে দুই বছরের জন্য নিউজিল্যান্ডে যান। ওয়েলিংটনে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে সোস্যাল সায়েন্স-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে চাকরিরত অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তৎকালীন ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার থেকে এম. এ পাস করেন।

অক্টোবর ১৯৯৬, ইউনিসেফ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে কনসালটেন্সি এবং বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থেকে সময় কাটান। ১৯৯৭-২০০২ সালের পাঁচ বছর মেয়াদী 'National Action Plan for Children' প্রণয়নে তিনি টিম-লিডার হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'নারী উন্নয়ন' এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'শিশু উন্নয়ন' ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সংযোজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

তিনি গ্রামীণ ট্রাস্টের উপদেষ্টা, গ্রামীণ-শিক্ষা পরিচালনা পরিষদের সদস্য, গণবিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও ট্রেজারার, কেমপেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর স্পন্সরশীপে প্রকাশিত বাৎসরিক 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট'- এর এডভাইজরি বোর্ডের সদস্য। এছাড়া বহুবিধ উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত আছেন।

জানিয়েছিলাম লেখাপড়া আগে শেষ হোক তার পর দেখা যাবে। এ ঘটনার পর আমাকে আর কেউ বিয়ে দিতে চাইবে না এই প্রত্যাশায় পড়ালেখায় মনোনিবেশ করেছিলাম। বিধি বাম, মেজ ভাই এরপরই আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে আসলেন।

পাত্র একজন সাহিত্যিক, চট্টগ্রামের নামকরা পরিবারের ছেলে। ভাইয়া বুঝালেন তার সাথে বিয়ে হলে আমার উচ্চ শিক্ষা অর্জনের স্বপ্ন পূরণ সহজ হবে। পাত্র চট্টগ্রামে সীমান্ত পত্রিকার সম্পাদক মাহবুব উল আলম চৌধুরী ।

তিনি তখন খ্যাতির শীর্ষে রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার জন্য তিনি প্রগতিশীল মহলে সর্বত্র প্রশংসিত। সেই মানুষকে আমার পরিণয় প্রার্থী হিসাবে ভেবে একটু গর্ববোধ হলো। কিন্ত আমার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রবল ইচ্ছার কাছে এই বিয়ে বিঘ্ন ঘটাবে ভাবনায় প্রত্যাখান করলাম। মেঝ ভাই বললেন সারারাত ভাবো। সময় নাও তারপর বল, সাথে বললেন অন্য কারো সাথে বিয়ে হলে সুগৃহিণী হয়তো হতে পারবি কিন্তু একজন সংস্কৃতিবান মানুষকে নিত্য সহচর হিসাবে নাও পেতে পারিস।
আমি রাগে দুঃখে ক্ষোভে সারারাত কাঁদলাম, খাবার বন্ধ। কিন্তু আবার ভাবছিলাম সামনে পরীক্ষা, অনেক ভাবনা চিন্তার পর মনে শক্তি সঞ্চয় করে স্থির করলাম বিয়েতে মত দিব তবে শর্ত থাকবে আমাকে এম.এ পর্যন্ত পড়তে দিতে হবে। এরপর প্রথম দেখা ভাইকে সাথে নিয়ে। বলতে বাধা নাই মাহবুব সুদর্শন আকর্ষনীয়, প্রথম দেখায় বলেছিল- আমি রাজনীতি করি। আমার বিরুদ্ধে হুলিয়া বের হতে পারে, এসব জেনে আমি বিয়েতে রাজী কি না, সে সত্যবাদী মানুষ, আজ এতকাল পর বলি আমি সেদিনের সিদ্ধান্ত যদি না নিতে পারতাম এমন বন্ধুর মত স্বামী, অভিভাবকের মত পথ প্রদর্শক, আর পরামর্শ দাতা স্বামী পেতাম না, সে আমার সকল অর্জনের অংশীদার আর অনুপ্রেরণা ও সহযোদ্ধা, প্রথম দেখার পর হতে তার প্রেমে পড়েছি বলতে পারি, জীবনের প্রতিটি পর্বে তার সাহচর্য, প্রীতি, ভালবাসা, মমতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি । তার রাজনীতি আর দেশপ্রেমের পরিচয় পেলাম বিয়ের ক'দিন আগেই।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে রাতে খবর পেলাম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অফিসে কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে তখন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের চট্টগ্রাম শাখা আহ্বায়ক। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতাটি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত প্রথম কবিতা হিসেবে স্বীকৃত।

এর কিছুদিন পর আমাদের বিয়ে হয়ে গেল জাঁকজমকভাবে। কিন্তু তার সাথে আমার সংসার শুরুর দিকেই আমি আমার পড়াশুনার কথা জানিয়েছিলাম। সুতরাং সহযোগিতা পেয়েছিলাম শুরু হতেই।

১৯৬০ সালে আপনার কর্মজীবনের শুরু। কেমন ছিল শুরুটা? কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন একজন সমাজকর্মী হিসাবে, কারণ মেয়েদের তখন এসব কাজ খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল?

আমার বয়স তখন ২৪ এবং আমি এক কন্যা সন্তানের জননী । আমার স্বামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় বেশীর ভাগ সময়ই তাকে আত্নগোপন করে থাকতে হতো । মেয়ে আর সংসার- দুইই আমার একা সামলাতে হতো। পাশাপাশি স্বামী ধরা পড়ে জেলে যাবার আতঙ্ক ছিল সর্বদা। এমন পরিস্থিতিতেও আমার পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি, পেরেছিলাম কারণ আমার স্বামী আমাকে সে সাহস যুগিয়েছে , শিখিয়ে দিয়েছিল মেয়েদের কিভাবে পথ চলতে হয় একা। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে ১৯৫৮ সালে স্নাতক শেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করি ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে। তখন আমি বি.এ পাশ করেছি, বি.এ পাশ মেয়ে তখন অনেক কম ছিল।

আমার কোন চাকরি খুঁজতে হয় নাই। আমাকে খুঁজে নিয়ে চাকরী দিয়েছে। সবগুলো চাকরি-ই আমার এমন। কি রকম চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছি। ছোট একটা অফিস। কর্মজীবনে পুরুষ সহকর্মীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কর্মক্ষেত্র শুরু হয়েছিল সমাজ কল্যাণ অফিসার হিসাবে। কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের নীচতলা। কিছুই জানতাম না। ছোট্ট একটা অফিস ছিল। গভর্নমেন্ট বলেছে আমরা কোন সম্পদ দেব না। স্যোশাল ওয়ার্ক স্যোশাল ওয়ার্কের মতই হবে। তোমরা নিজেদের রাষ্ট্রের আর সমাজের সম্পদ ব্যবহার করে কাজ করবে, যেখানে উন্নতি করা যায় করবে। কোন টাকাও দেয় নি।

মিউনিসিপ্যালটিকে বলে ছোট্ট একটা অফিস ম্যানেজ করেছি। ছোট্ট একটা রুম দিয়েছে মিউনিসিপ্যালটি। দুইটা চেয়ার ছিল, অফিসার দুইজন ছিল বলে আর একটা বেঞ্চ ছিল ওয়ার্কারদের বসার জন্য। আমি যখন জয়েন করেছি আমি ছিলাম দ্য থার্ড ওয়ান। নিয়োগের ক্ষেত্রে

জামাতার সাথে

পুরুষদেরই প্রাধান্য ছিল। চেয়ার ছিল দুইটা, বসার জায়গা ছিল না। টেবিলও ছোট, ব্যাগ রাখার জায়গা হত না। তো আমি দাঁড়িয়ে কাজ করতাম ব্যাগ কাঁধে নিয়ে। পুরুষ সহকর্মীরা কেউ কোনদিন বসার জন্য অফার করেনি। আমার খুব মন খারাপ হত। বাসায় এসে কোন কোন দিন কাঁদতাম। আমার স্বামীকে বলতাম। ও খুব সাপোর্ট দিত। ও সাপোর্ট না দিলে কিছু করতে পারতাম না। ও আমাকে বুঝাতো যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরকে দ্বিগুন প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে হয়। অনেক ধৈর্য্য ধরতে হয়।

এভাবে আমার প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। এটাই শিক্ষা আর সবাইকে বলার যে কিভাবে একজন নারী তার পারিবারিক এবং পেশাগত সমস্যার মোকাবেলা করবে, কোন পন্থা অবলম্বন করলে পেশাগত সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করা সহজ হবে, কিভাবে চিন্তা করবে, কিভাবে বৈরী পরিবেশে সহকর্মীদের সাথে সমঝোতা করে কাজ করতে হয়। যেভাবে আমি আস্তে আস্তে ওদেরকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে শুরু করলাম এবং আস্তে আস্তে চেয়ার দখল করেছি। আধা ঘণ্টা আগে চলে যেতাম। তো একজন দাঁড়িয়ে থাকতো কিন্তু আমাকে তো উঠিয়ে দিতে পারে না। এভাবে নিজের অধিকার নিজে আদায় করলাম।

এটাও একটা শিক্ষা যে নিজের অধিকার নিজের আদায় করতে হবে। নিজের অস্তিত্বকে নিজেই বজায় রাখতে হবে। এর জন্য দরকার আত্মবিশ্বাস, অধ্যাবসায় এবং ধৈর্য্য। এভাবেই কর্মজীবনে যোগ্যতা প্রমাণের শুরু। কাজ করতে হয়েছে বস্তির সুইপারদের সাথে। বস্তিতে গিয়ে মিশতে হতো ওদের সাথে , শুনতে হতো ওদের কথা, অনেক সময় খেতে হতো ওদের দেওয়া খাবার। সমস্যা হয়নি আমার, আমি বিশ্বাস করি মানুষকে মানুষই ভাবতে হয়। সহকর্মীদের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই অর্জন করতে হয়েছে নিজের যোগ্য অবস্থান।

সন্তান আর সংসার; সেই সাথে কর্মজীবন কেমন করে ভারসাম্য রেখেছিলেন সব কিছুর?

আমার পেশায় আমি সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করতাম নিষ্ঠার কমতি হয়নি কখনও। কিন্তু কতটা পেরেছি জানি না তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিলনা। তাই বলে সন্তান আর পেশার মাঝে যে সংঘাত হয়নি তা নয়। কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া উচিত? এই প্রশ্নের মুখোমুখি অনেকেরই হতে হয় কর্ম জীবনে। আবার এই দুইয়ের মাঝে সামঞ্জস্য টেনে পথ চলা বেশ কঠিন ছিল। কোন কারণে যখনই মনে হয়েছিল আমি আমার শিশুকে অবহেলা করেছি তখন থেকেই আমি ও মাহবুব আমার মেয়ের প্রতি সচেতনভাবে যত্নবান হতে শুরু করলাম।

এই ব্যাপারে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম। মা-বাবার প্রাত্যহিক আদর-যত্ন-স্নেহ-ভালবাসা থেকে আমার শিশুকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। তার বাবা আমার শূণ্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যে মেয়ের প্রতি আরো বেশি যত্নবান হয়ে উঠলো। কিন্তু শিশুর জন্য মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকাই তো গুরুত্বপূর্ণ। একে অপরের পরিপূরক। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য আরো প্রয়োজন মা-বাবার মধ্যে বন্ধুসুলভ ব্যবহার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে পরিবারের যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব। এভাবে সমঝোতার মাধ্যমে আমরা জীবনে অনেক কঠিন সময় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছি।

আপনার সংসার জীবন কেমন ছিল?

আমরা আর্দশ দম্পতি ছিলাম, একথা আমি বলবো না। তবে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক বরাবরই ছিল। আমাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, দ্বিমত পোষণ ইত্যাদি হতো। সাংসারিক বিষয়ে, আমরা আত্নীয়স্বজনের রাজনৈতিক আর্দশ নিয়ে, এমনকি টাকা পয়সা ব্যয় সম্পর্কেও অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হতো। তবে একথা সত্যি যে যতদিন আমি লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি এবং নিজে রোজগার করতে পারিনি, ততদিন আমার আত্নশক্তির ভিত ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সাহস করে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারতাম না। নিজে শক্তি সঞ্চয় করে যখন যুক্তিপূর্ণ কথা বলা শুরু করলাম, তখন মনোযোগ সহকারে তা শোনার জন্য মাহবুবের চেষ্টার অন্ত থাকতো না।

আপনি সরকারী বেসরকারী সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, পরিবেশ ভেদে নারী পুরুষের বৈষম্য কেমন ছিল?

আমার কর্মজীবনের শুরুর কথা তো আগেই বলেছি। মেয়েদের অংশগ্রহণ কম ছিল, সাথে ছিল মেয়েরা তুলনামূলক ভাবে অদক্ষ এটা প্রমাণের প্রচেষ্টা । বড় বড় কাজ বা নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে মেয়েদের মূল্যায়ন যথাযথ ছিলনা। এটা সরকারী বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই সমান। কাজের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এ বৈষম্য নাই। ওখানেও গিয়ে দেখলাম অনেক বৈষম্য আছে। পার্থক্য ছিল কেবল পরিবেশের তবে আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করা যতটা সহজ সরকারীভাবে ততটা সহজ নয়।

তবে আমরা মেয়েরা তখন যেখানে কাজ করেছি একে অন্যকে সাহায্য করেছি আন্তরিকতার সাথে । তবে বৈষম্য ছিল। বর্তমানে কমছে কারণ মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে কাজ করছে কিন্তু তারপরও বৈষম্য থাকবে হয়তো ভিন্নরূপে । কারণ আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের খুব একটা পরিবর্তন এখনও সাধিত হয়নি। তাই প্রয়োজন

মাহবুব উল আলম চৌধুরী

মাহবুব উল আলম চৌধুরী একজন কবি, সাংবাদিক এবং ভাষা সৈনিক। তিনি একুশের প্রথম কবিতা "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" র লেখক কবি। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর জন্ম চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরা আসাদ চৌধুরী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহমদুর রহমান চৌধুরী এবং মাতা রওশন আরা বেগম। পরবর্তীতে তিনি নারীর উন্নয়নের মূলধারার অন্যতম সৈনিক এবং ইউনিসেফের তৎকালীন প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং সেকশনের প্রধান জওশন আরা রহমানের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৪৭ সালে মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এ সংগঠনের কর্মী হিসেবে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নেন। এ বছরেরই নভেম্বর মাসে তার সম্পাদনায় সীমান্ত নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত নিয়মিত ছাপা হত এবং দুই বাংলার প্রগতিশীল লেখকরা এতে লিখতেন। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম প্রাদেশিক ভাষা আন্দোলন কমিটির সদস্য। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি" কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতাটি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত প্রথম কবিতা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে চট্টগ্রামে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী।

১৯৫২ র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী। ১৯৫৩ সালে গণতন্ত্রী পার্টি গঠিত হলে তিনি তার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কাজ করেন।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী নিজ শহর চট্টগ্রাম ও সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী চট্টগ্রামে প্রথম বিশ্বশান্তি পরিষদ গঠন করেন ১৯৪৯ সালে। ১৯৫৩ সালে তিনি কবি নজরুল নিরাময় সমিতি গঠন করেন এবং এ সমিতির অর্থায়নে অসুস্থ কবি নজরুলকে চিকিৎসাকল্পে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭২ সালে তিনি চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী আয়োজিত টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনেও তাঁর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক স্কোয়াড অংশগ্রহণ করে।

১৯৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে মাহবুব উল আলম চৌধুরীকে বাংলা একাডেমী কর্তৃক ফেলোশিপ এবং ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক সংবর্ধনা দেয়া হয়। ২০০৫ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় পুরস্কার, ২০০৬ সালে ঋষিজ পদক ও সংবর্ধনা দেয়া হয়। ২০০৯ সালে তিনি মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।

২০০৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি হন। পাঁচদিন কোমায় থাকার পর মাহবুব উল আলম চৌধুরী ২৩ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে। তাঁকে সমাহিত করা হয় ঢাকার বনানী গোরস্থানে।

বৈষম্য মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সরকারের সংগে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট সংযম আর ধৈর্য্যের সংগে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা মোকাবেলা করেছি, অন্যদিকে ইউনিসেফে যাওয়ার পর নতুন নতুন নিয়ম কানুন মেনে প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব পালন করাও ছিল একটা চ্যালেঞ্জ।

নারী কর্মকতার অধীনে কাজ করার মানসিকতা তখন অনেকের ছিল না। কিন্তু সহকর্মীর সহযোগিতা ছাড়া একটা টিমওর্য়াক ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন। আর দলের ছেলেরা তো চাইতোই মেয়ে হিসাবে আমার ব্যর্থতা প্রমাণের। এজন্য আমি সবসময় তাদেরকে নিয়েই কাজ করতে চাইতাম। তাদেরকে সম্মান দিয়েই নিজের সম্মান আদায় করে নিয়েছি। নিজের কাজ আর দক্ষতা আর মানবিকতা দিয়ে দলের প্রধান না হয়ে কাজ করেছি দলের একজন হিসাবে। এই বিষয়গুলোর চর্চা দিয়ে আমি সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করেছি। যে কাজ করতে দেয়া হতো না মেয়ে বলে সেটাই করে প্রমাণ করতাম মেয়েরাও পারে। কারণ আমি কেবল আমার জন্য ভাবতাম না ভাবতাম আমি না করলে আরেকটা মেয়ে কেমন করে এখানে আসবে অর্থাৎ পথ তৈরী করা। সে সময় আমরা যারা বিভিন্ন পেশায় কাজ করতাম তারা একে অপরের পাশে ছিলাম সহযোগী হিসাবে।

আপনাদের কাজ করার সময়টা আর এখন কাজ করার সময়টা ভিন্ন। আপনারা যেমন আন্তরিকতা আর দৃঢ়তা দিয়ে সমস্যাগুলোকে উতরে গেছেন সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল?

এখনকার নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাওয়ার পেছনে আছে সেসব নারীদের ভূমিকা যারা সামাজিক পারিবারিক এবং পেশাগত প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে স্বপ্ন দেখিয়েছে এবং সাহস জুগিয়েছেন অন্য নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৬০ থেকে আমরা নারীরা যেভাবে প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করে আসছিলাম তাতে করে একটু একটু করে মেয়েদের জন্য সুযোগ তৈরী হয়েছে আর আমরা শিখেছি কাজের প্রত্যেকটা স্তরে। কর্মজীবনে আমি নারীদের উন্নয়নেই বেশী কাজ করেছি। তাদের আর্থিক স্বাধীনতাই তাদেরকে এগিয়ে যেতে পারবে এ বিশ্বাস হতেই আমি ইউনিসেফে কর্মরত অবস্থায় কাজ করেছি ড. মুহম্মদ ইউনুসের গ্রামীন ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋন প্রকল্পের সাথে। আজ এই প্রকল্পের সফলতায় গ্রামের হাজারো নারী আত্মনির্ভরশীল।

যতদিন সরকারী চাকুরী করেছি চেষ্টা করেছি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করার । পরে ইউনিসেফের হয়ে কাজ করেছি উইমেন'স ডেভেলপমেন্ট, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট , নারীর সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে। সম্ভবত ১৯৮৭ সাল, তখন ইউনিসেফের ১৯৮৫-১৯৮৮ সালের তিন বছর মেয়াদী কান্ট্রি প্রোগ্রাম চলছে এবং নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী কান্ট্রি প্রোগ্রাম (১৯৮৮-১৯৯৩) সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমাদের উইমেন'স ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের তরফ থেকে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম অনেকদিন ধরে।

নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থান পেতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইউনিসেফের পক্ষ থেকে এককভাবে পা না বাড়িয়ে দাতাগোষ্ঠী হিসেবে আমরা একজোটে কিছু করতে পারি কি না তা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম। ইউনিসেফের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত উল্লেখিত মিটিংয়ে আমি প্রস্তাব করলাম, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়ে ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমরা দাতাগোষ্ঠীর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

এতে কেউ অকুণ্ঠ সমর্থন জানালো। আর কেউ নেতিবাচক কথা বলল। আবার কেউ ঠাট্টার সুরে নানা মন্তব্য করল। ড্যানিডার শিরীন হক এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সুজান ডেভিস আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিল। বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াহিদা হক বললো, দাতাসংস্থার তরফ থেকে দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সংযোজনের জন্য কাজ করা আপনার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার এই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা দাতা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি

হয়ে প্রত্যক্ষভাবে এ কাজ করতে পারি না। কিন্তু এতে নিরাশ না হয়ে বললাম, আমার সাড়ে আঠারো বছরের সরকারি চাকরি এবং ইউনিসেফে আট বছরের (তখন পর্যন্ত) অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিভাবে এগুতে হবে তা আমার অজানা নয়।

সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাকে সামনে রেখে এবং পশ্চাদ থেকে কাজ করে কিভাবে তাদেরকে শক্তিশালী করতে হয়, সে কৌশলও আমার অজানা নয়। সকলের সমর্থন এবং সহায়তা পেলে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।আমি এই কাজকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি প্রায়ই সফল হয়েছি। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সরকারী যে কোনো সংস্থা আমাকে সহযোগিতা করছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কোনো দিন আত্মবিশ্বাস হারাইনি। আমার এই আত্মবিশ্বাস এবং কমিটমেন্টই সবসময় আমাকে পথ নির্দেশনা দিয়েছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টায় লেগে গেলাম। এর মধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গেল। ইউনিসেফের ১৯৮৮-১৯৯৩ কান্ট্রি প্রোগ্রাম হয়ে গেল। Advocacy, Awareness and Strengthening of Information Base for Women in Development (AASIB) প্রজেক্টের আওতায় এই কাজের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে রাখলাম। এর বাস্তবায়ন সংস্থা ছিল মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর, তখনো অধিদপ্তরে উন্নীত হয় নি।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী-উন্নয়ন বিষয়ক ম্যাক্রো অধ্যায় সম্পর্কিত কাজ করার জন্য একটি কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করলাম। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন অধ্যায়টা সংযোজনের উদ্দেশ্য ছিল নারী উন্নয়ন বিষয়টিকে মূল ধারার সাথে সংযোজিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি বিশ্বব্যাংক সহ সকল দাতা সংস্থাকে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার চেষ্ঠা করেছি এবং তাদের সহযোগিতায় বিষয়টি প্রস্তাবনা আকারে সরকারের কাছে উপস্থাপনা করি। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা এবং নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের (তখন বলা হতো নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়) সাথে কাজ করেছি দীর্ঘদিন। অনেকে আমাকে ঠাট্টাও করেছে, বলেছে এ হবার নয় সরকারী কাজ , আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি। আমি বলেছি দেখি না করে কি হয়। থেমে যাই নি কিন্তু। থেমে যাই নি কারণ আমার সরকারী কাজের অভিজ্ঞতা আছে। আমি জানতাম কিভাবে কাজটা করিয়ে আনতে হয়, কার কাছে যেতে হয়, একটা টেবিল এ কতবার যেতে হয়। আমি ইউনিসেফ এ উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা ছিলাম। প্রথমে উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট এর প্রধান ছিলাম পরে প্রোগ্রাম প্ল্যানিং সেকশন এরও প্রধান ছিলাম।

সেটা হয়েও আমি প্ল্যানিং কমিশন এ তারপর উইমেন্স অ্যাফেয়ারস মন্ত্রণালয় সহ আরও অনেক মন্ত্রণালয়ের কেরানীদের যাদেরকে এখন এ্যাসিসট্যান্ট বা সেক্রেটারি বলে ওদের কাছে অনেকবার গিয়েছি, গিয়েছি টাইপিস্ট এর কাছে কতবার । টাইপিস্ট এর কাছে বসে বসে ডিকটেশন দিয়েছি তা না হলে ওরা লিখবে না ৫/১০/১৫ দিন দেরি করবে। ওরা ভেবেছে ওরে বাবা এত বড় অফিসার আমাদের কাছে এত বার এসেছে আমরা কাজটা তাড়াতাড়ি করে দেই। এটাই ছিল আমার নিজস্ব

একমাত্র মেয়ের সাথে

কর্মপন্থা। এভাবেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সংযুক্ত হয় নারী উন্নয়নের বিষয়টি ।

একইভাবে আন্দোলনের মাধ্যমেই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিশুদের অধিকার অধ্যায়টা সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এগুলো আর বন্ধ হবে না। হয়ত উইমেন'স ডেভেলপমেন্ট হিসেবে থাকবে না যার কারণ হল প্রথমে দেয়া হয়েছিল ফোকাস করার জন্য আসল উদ্দেশ্য ছিল মূল ধারায় আনা। এখন সবকিছুতেই আছে। এমনকি অর্থমন্ত্রণালয়েও উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট, উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট এর উপর কোশ্চেন পেপার আছে। একজনের জায়গায় যদি দশজনও চিন্তা করে সেটাইতো সফলতা। এখন সুবিধাটা সবাই ভোগ করতে পারছি। আমরা হয়তো চলাটা শুরু করে দিয়েছিলাম এই যা। তবে কোথায়ও কোথায়ও এর কার্যকারিতা একটু কম এটা নিশ্চিত করতে হবে এই চাকা থামলে চলবে না। এখন দরকার লিঙ্গ বৈষম্য দুরীকরণ। আমি আশা করি হবে। চেষ্টা চলছে, লেখালেখি হচ্ছে পত্র পত্রিকায়। পেপার খুললে প্রত্যেক পাতায় এমনকি বিজনেস পাতায়ও ছেলেদের সাথে অন্তত একটা নারী আছে প্রত্যেক জায়গায়। এটা ইতিবাচক। এটাই আমরা চাইতাম সবজায়গায় মেয়েদের অস্তিত্ব থাকবে। তার মানে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

এখনকার মেয়েদের চ্যালেঞ্জটা আর আপনাদের সময়কার চ্যালেঞ্জটার মধ্যকার তুলনায় আপনি কি বলবেন?

আমাদের তুলনায় এখনকার মেয়েদের চ্যালেঞ্জটা বেশী। নারী সহিংসতা তো এখন কেবল বড় সমস্যাই নয় বরং একটা মারাত্মক ব্যাধি হিসাবে রূপ নিয়েছে। অনেকের দেখা যায় চাকুরী করলেও নিজের টাকা নিজে খরচ করতে পারার স্বাধীনতা নাই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নারী তার উপার্জিত টাকা নিজে খরচ করতে না পারবে ততক্ষণ সে মানসিকভাবে স্বাধীন হতে পারবে না। অর্থনৈতিকভাবে মুক্তিই কিন্তু নারী স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় জায়গাটা। অর্থনৈতিকভাবে মুক্ত হলেই চিন্তার মুক্তি ঘটে। সে অনেক ভাল ভাল চিন্তা করতে পারে। ভাল ভাল অনেক কাজ সে করতে পারে। সহিংসতা আগেও ছিল এখনও আছে,কিন্তু এখন মাত্রাটা বেশি এবং নির্যাতন ও হয়রানির ধরনটা ভিন্ন। আবার আগে জনসংখ্যাও কম ছিল, গনমাধ্যমের সংখ্যাও এত ছিলনা। এগুলা বাইরেও প্রকাশিত হতো না আবার মেয়েরাও সমাজের ভয়ে বলত না। এখন মেয়েরা নিজেরা রোজগার করছে, আত্মমর্যাদা বেড়েছে- সে সাথে তাদের মত প্রকাশের সাহসটুকুও তারা অর্জন করতে পেরেছে কিছুটা হলেও। তাই সমস্যা এবং সহিংসতাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। তবু তা ঘটনার তুলনায় খুব কম। যত প্রকাশিত হবে সচেতনতা তত বাড়বে।

নির্যাতনটা বেড়ে গেছে ভিন্ন মাত্রায়, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত অনেক পরিবারের মেয়েরা স্কুলে যেতেই ভয় পাচ্ছে। সারাক্ষন বিব্রতকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে

হচ্ছে, ইভটিজিং এর শিকার হচ্ছে। মেয়েরা অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ভিন্ন এক গন্ডিতে। তবে এত বাধা সত্ত্বেও মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে এটা বলতে হবে। তবে আরো এগিয়ে যেতে হবে।

এখনকার নারীরা একসাথে ঘর বাহির সামলায় বলে বিশ্রাম নেয়াও সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে তারা এক ধরনের অস্থিরতায় ভুগে। আগের মত ধৈর্য্য নেই। তাদেরকে একসাথে উপার্জন করতে এখনকার মেয়েরা সত্যি অনেক ক্লান্ত। আবার এখন সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় অবস্থাও অন্যরকম। এখন দুর্নীতি বেড়ে গেছে, তার মধ্যে টিকে থাকা তারপর এতগুলো পুরুষের মাঝে টিকে থ াকাতে মেয়েদেরকে ৪/৫ গুন বেশি কাজ করতে হয়। একটা মেয়ে একটা ভুল করলে ১০০ বার পয়েন্ট আউট করে দেখানো হচ্ছে কিন্তু একটা ছেলে ভুল করলে কেউ লক্ষ্যই করছে না। এই যে চ্যালেঞ্জিং কাজ করে যাওয়াটা, এটা খুব কঠিন কাজ।

এমতাবস্থায় করণীয় কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

যে সমস্যা গুলো দেখা দিয়েছে তা থেকে উত্তরণ পাওয়া খুব কঠিন এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন এখনও পরিপূর্নভাবে যায়নি। ছেলেরা এখনও পরিপূর্ণভাবে মেয়েদেরকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে শেখেনি। স্ত্রীকে তাদের বন্ধু ভাবতে পারছে না , পারিবারিক এবং সন্তানের পড়াশুনার কাজে তারা স্ত্রীকে যথাযথ সহযোগিতা করছে না। আবার মেয়েরা তাদের স্বামীকে বোঝাতে পারছে না, তারা নিজেরাও মেনে নিয়েছে সংসার আর সন্তান বড় করার দায় তাদের একার। স্বামীকেও সহযোগিতা করার সুযোগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য মেয়েদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। নিজের অধিকার আদায় আর নিজের সম্মান রক্ষায় নিজেকে হতে হবে সোচ্চার আর তার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস, সাহস আর কৌশল।
মেয়েদের মনে রাখতে হবে সমস্যা গোপন রাখলে তার সমাধান কেউ করতে পারবে না। এ পরিবর্তন আসতে কতদিন লাগবে তা জানি না। এটা করতে হলে সমতায় আসতে হবে। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন। তবে মনে রাখতে হবে জেন্ডার ইকুয়ালিটির মানে এই না যে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সমান সমান-বরং বিষয়টা হলো রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধার সমতা। তাছাড়া মেয়েদের উচিত সফল নারীদের সম্পর্কে বেশী বেশী করে পড়াশুনা করা, তাদের সর্ম্পকে জানা কারণ তাদের অভিজ্ঞতা গুলোকে কাজে লাগাতে পারলে সমস্যা মোকাবেলা করা তাদের জন্য একটু সহজ হতে পারে।

এক্ষেত্রে আপনার কর্ম অভিজ্ঞতাও হতে পারে এখনকার নারীদের জন্য অনুকরণীয় এবং যতদূর জানি আপনি আপনার আত্মজীবনীমুলক একটি বই লিখেছেন। লেখার শুরুটা কিভাবে হলো?

অনুকরণীয় হবে কিনা জানি না,তবে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার পথে কাজে লাগলে ভালো লাগবে। আমি আসলে বই লেখার উদ্দেশ্যে লেখাটা শুরু করিনি। আমি আমাদের সময়কার গল্প করতাম আমার নাতির সাথে। আমরা কিভাবে কাজ করতাম ,অফিস ট্যুরে যখন যেতাম কোন থাকার জায়গা থাকতো না, স্কুলের বারান্দায় থাকতে হতো, নৌকায় করে যেতে হতো, গাধার পিঠে উঠেও গিয়েছি। এগুলো যখন বলতাম সে বলতো নানু আমরা কল্পনাই করতে পারি না, আমার সঙ্গীরা তো বুঝবেই না। তুমি এগুলো লিখে ফেলো। লিখলে এগুলো থেকে যাবে। এভাবে ওর উৎসাহে শুরু করি। কিছুটা লিখে যখন আমার স্বামীকে পড়ে শোনাই। তিনি বললেন তুমি লিখতে থাক। তখন আমি চাকুরিতে কর্মরত, তাই কাজও করি, সাথে বই লিখি। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস টাইপের। যেটা করতাম একেবারে মন প্রাণ থেকেই করি। এভাবেই শুরু। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হলে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে মিশতে হয়। তাদের জন্য কাজ করতে হলে তাদেরকে জানতে হয়, বুঝতে হয়। আমরা থিওরি পড়ি এরপর কাজ করতে যাই। তখন দেখি যে থিওরির সাথে আর প্র্যাকটিক্যাল কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।এই ফারাকটা পূর্ন করার জন্য অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হয়, অনেক

অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সবার সাথে কথা বলে বলে কৌশল ঠিক করতে হয়। যে শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করতে হয়ে, ওদের সাথে মিশে যেতে হয়, সবাইকে সম্মান জানাতে হয়, মর্যাদা দিতে হয়, কথা আদায় করতে হয়। এইগুলো কিন্তু তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতা যা আমি অর্জন করেছি আমার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে। বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়, থিওরিতে এগুলো থাকে না।

তাই মনে করেছি এই অভিজ্ঞতাগুলো এবং সমস্যা সমাধানের কৌশল হতে অন্যেরা হয়তো কিছু শিখতে পারবে, এই ভাবনা হতেই আমার বই লিখা। বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেশের অনেক বড় মাপের মানুষেরা এসেছিলো, যেমন ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী ও 'দৈনিক ইত্তেফাক' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং "পাক্ষিক অনন্যা"র সম্পাদক তাসমিমা হোসেন। তবে আমি সেভাবে এর প্রচার করার চেষ্টা করিনি। আমি আমার মত করে কাজ করেছি যদি কারো উপকারে আসে বিশেষ করে আমাদের দেশের নারীদের যারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে বইটি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। চেষ্টা করছি ছড়িয়ে দেবার যাতে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাঁধা অতিক্রম করতে তাদেরকে সাহস যোগাতে পারি। কারণ মেয়েদের এখনও বহুদূর হাঁটতে হবে।

নারীর অধিকারই কেবল নয় দেশের সার্বিক উন্নয়নে সঠিক নেতৃত্বের কতটা প্রয়োজন রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ? আপনার দৃষ্টিতে দেশের নেতৃত্বের বর্তমান অবস্থা এবং উত্তরণ চর্চা কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

যেকোন ক্ষেত্রেই সঠিক নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ, সে সাথে নেতৃত্ব মেনে চলাটাও প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে সার্বিক উন্নয়নে। নারী উন্নয়ন এবং সার্বিক উন্নয়নে নেতৃত্বের কথা যদি বলি তাহলে বলবো আমরা একটি চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করেছি । বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে নারীর সংখ্যা বেশী এবং উনারা প্রগতিশীল এবং উন্নয়ন বান্ধব। সুতরাং এই সুযোগ কাজে না লাগাতে পারলে তা আমাদের ব্যর্থতা।

সেজন্য কাজ করার সময় অন্যকে দায়িত্ব দেওয়া, দায়িত্ব দিলে সে ঠিকমত পারছে কিনা সেভাবে তাকে সাহায্য করা, দলের সদস্যদের উন্নয়ন তদারকি করার প্রয়োজনে শিখিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া।

শিখিয়ে দেওয়ার সময় এমনভাবে বলা যেন সে নিজেকে ছোট মনে না করে। এগুলো সঠিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য যা সকল নেতৃত্বস্থানীয়দেরই চর্চা করা জরুরী। এই চর্চার এখন বড়ই অভাব।

এখনকার নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার কি উপদেশ?

প্রথমে বলব আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, সাথে থাকবে ধৈর্য্য। মনোযোগ দিয়ে অন্যকে শুনতে হবে। নিজে কথা বলার আগে অন্যের কথা শুনবে, অন্যেকে সম্মান করবে, মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিবে, তাকে গ্রহণ করবে। তারপর যেকোন জিনিসের জন্য অধৈর্য্য হলে চলবে না।

ধৈর্য্য ধরতে হবে। শুধু সমস্যা সমস্যা বলে চিৎকার করলেই হবে না সমস্যার উৎস এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে ভাবতে হবে। তার যদি কোন ভাল উপদেষ্টা থাকে তার সাথে পরামর্শ করতে হবে, স্বামী বন্ধুর মত হলে তার সাথে আলোচনা করতে হবে।

আলোচনা করলে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারে। তারপর সময় নিয়ে আস্তে আস্তে সমাধানের কৌশল বের করতে হবে, ধৈর্য্য নিয়ে সে কৌশলের প্রয়োগের সমাধানে এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করতে হবে যতই আমার শত্রু হোক না কেন। হাসি দিয়ে, ভাল ব্যবহার দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ।

আসল কথা হল মানুষকে তার মর্যাদা দেয়া। এসব করতে পারার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাটাও গুরুত্বপূর্ণ, তাই নিজের প্রতি যত্ন নিতে হবে নিজেকেই। পরিবারকে বোঝাতে হবে নিজের কাজের গুরুত্ব এবং সহযোগী হয়েই সহযোগিতা আদায় করতে হবে।

সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
তোমাকেও ধন্যবাদ

নাজনীন নাহার
লেখক ও সাংবাদিক

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে অন্যতম হল নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন যা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় অপরিহার্য। তাছাড়াওপ্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা বা স্যানিটেশন।

স্যানিটেশনঃ

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের জন্যপ্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর পরিবেশই হল স্যানিটেশন। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও মলমূত্র নিষ্কাশন, গৃহস্থালির বর্জ্য, পানি ও ময়লা-আবর্জনা অপসারণ এবং ব্যক্তিগত ও পরিবেশের তথা পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতাই স্যানিটেশনের অন্তর্ভুক্ত।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্যানিটেশনের ভূমিকাঃ

- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা।
- মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ রোধ করা ।
- মলমুত্র ও পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ, যেমন- কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া।
- বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ করা।
- ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের প্রভাবঃ

- অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের প্রভাব বহুমুখী। একদিকে এটি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে অন্যদিকে এটি পরিবেশকেও হুমকির সম্মুখীন করে।
- অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের কারণে মানুষ নানা ধরনের সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যেমন- ডায়রিয়া, আমাশয়, কৃমি ও কৃমিজনিত রোগ, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, চর্মরোগ, চোখের অসুখ প্রভৃতি। এছাড়াও, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশনের প্রভাবে মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ হতে পারে যা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে। পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে গেলে পরিবেশস্থ সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্র ব্যাহত হয় যা ক্রমান্বয়ে পরিবেশ বিপর্যয় ডেকে আনে।

প্রতিরোধঃ

- খোলা স্থানে বা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে।
- যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
- জমে থাকা সকল প্রকার ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
- যখনই মল ও ময়লা আবর্জনা হাতের সংস্পর্শে আসবে তখনই দু'হাত সাবান ও পরিস্কার পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- যেখানে সেখানে থুথু ও কফ ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- রান্না ও গৃহস্থালি কাজে সবসময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।
- খাবার আগে অবশ্যই ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং হাতের নখ ছোট রাখতে হবে।
- সর্বোপরি, নিজের ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতন থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনঃ

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন হল এমন একটি ল্যাট্রিন বা পায়খানা যা ব্যবহারের ফলে মলমূত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে আবদ্ধ করা হয় যা কোনভাবেই সরাসরি খোলা বাতাস, ভূপৃষ্ঠের পানি ও মাটি, পরিবেশের কীটপতঙ্গ, পশুপাখি ও মানুষের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে মলমূত্র থেকে রোগজীবাণু ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করে না।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের জন্য স্থান নির্বাচনঃ

- বসতবাড়ির কাছাকাছি, যেখানে সব বয়সের সবাই যে কোন সময় সহজেই যাতায়াত করতে পারে।
- কিছুটা উঁচু স্থানে, যেখানে পানি না জমে এবং বন্যা হলে পানি না ঢোকে।
- নিরাপদ পানির উৎস থেকে অন্তত ৩০ ফিট দূরে যেন মাটির নিচ দিয়ে ল্যাট্রিনের দূষিত পানি নিরাপদ পানির উৎসকে দূষিত না করে।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের নিয়মঃ

- ল্যাট্রিনের জন্য আলাদা স্যান্ডেল ব্যবহার করা,
- ল্যাট্রিনের ভিতর পানি ও সাবানের ব্যবস্থা রাখা,
- মলত্যাগের পর শৌচকাজ ও হাত ধোয়ার জন্য সাবান ও পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করা,
- প্যানে পর্যাপ্ত পানি ঢালা যেন প্যানে মল লেগে না থাকে,
- কিছুদিন পর পর প্লাটফর্ম সহ ল্যাট্রিনটি পরিস্কার করা।

নিরাপদ পানিঃ

যে পানিতে মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর রোগজীবাণু নেই এবং সহনীয় মাত্রার থেকে অতিরিক্ত আর্সেনিক ও লৌহ সহ অন্যান্য খনিজ বা রাসায়নিক দ্রব্য নেই তাকেই নিরাপদ পানি বলে।

নিরাপদ পানির বৈশিষ্ট্যঃ

- বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন,
- রোগজীবাণু ও ময়লামুক্ত,
- মানবদেহের জন্য সহনীয় মাত্রার থেকে কম রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ যুক্ত।

নিরাপদ পানি কেন প্রয়োজন?

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরাপদ পানি প্রয়োজন। যেমন-

- পান করার জন্য
- হাত ধোয়ার জন্য

- থালাবাসন পরিস্কার করার জন্য
- শাকসবজি ও ফলমূল ধোয়ার জন্য
- রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য

পানি দূষণের কারণঃ

- মানুষ ও পশু-পাখির মল-মূত্র পানিতে মিশলে
- মৃত জীবদেহ ও ময়লা-আবর্জনা পানিতে ফেললে
- পানিতে থালা-বাসন মাজলে, কাপড় কাচলে ও গরু মহিষ গোসল করালে
- ফসলের জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পানিতে মিশলে
- কলকারখানার বর্জ্য ও লঞ্চ-স্টীমার থেকে নির্গত জ্বালানী তেল পানিতে মিশলে
- প্লাস্টিক, পলিথিন পানিতে ফেললে এবং বাঁশ, পাট পানিতে পচালে
- ল্যাট্রিনের পিট হতে পানির উৎস কাছাকাছি থাকলে
- নলকূপের গোড়া বাঁধানো না থাকলে

নিরাপদ পানির উৎসঃ

- আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ ও গভীর নলকূপের পানি
- চারপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং ঢাকনাযুক্ত কূয়োর পানি
- বৃষ্টি শুরুর ১৫ মিনিট পর পরিস্কার টিনের চাল ও ছাদ হতে সংগৃহীত বৃষ্টির পানি
- পন্ড-স্যান্ড ফিল্টারের (PSF) মাধ্যমে পরিশোধিত পানি
- পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পরিশোধিত পানি
- ফুটিয়ে বা অন্যভাবে বিশুদ্ধকৃত ভূপৃষ্ঠস্থ পানি

ভূপৃষ্ঠস্থ পানি নিরাপদকরণঃ

পানি ফুটিয়ে- পানির পাত্র চুলার উপর রেখে তাপ দিতে হবে। পানি ফুটে যাওয়ার পর জীবাণু ধ্বংস করতে আরও ২০ মিনিট টগবগ করে ফুটাতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।

বি:দ্রঃ- পানি ফুটিয়ে আর্সেনিক দূর করা যায় না।

পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি বা ব্লিচিং পাউডার দিয়েঃ

একটি পাত্রে ২০ লিটার পানি নিয়ে তাতে ২টি পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি বা ৫ মিলিগ্রাম (চা চামচের চার ভাগের একভাগ) ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। ৩০ মিনিট পর পানি ব্যবহার উপযোগী হবে।

ফিটকিরি দিয়েঃ

একটি পাত্রে ২০ লিটার পানি নিয়ে তাতে ১০ মিলিগ্রাম ফিটকিরি মিশিয়ে ভালভাবে নাড়তে হবে। এক ঘন্টা পর উপরের ৯০% পরিস্কার পানি অন্য একটি পাত্রে ঢালতে হবে। তলানি সহ বাকি ১০% পানি ফেলে দিতে হবে।

বি:দ্রঃ- ফিটকিরি দিয়ে পানি সম্পুর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায় না। তবে দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দূষিত পানি ব্যবহার করা থেকে এটি তুলনামূলকভাবে ভালো।

ডাঃ শাকিল তানভির
উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
বেতাগী - পটুয়াখালী

We Jute

www.wejutebd.com

404, Golam Rasul Plaza, 1st Floor (A-4), Dilu Road, New Eskaton, Dhaka.
email: info@wejutebd.com, **01926677541**

Olympic

Amin Court, 6th Floor,62-63 Motijheel C/A,Dhaka-1000,Bangladesh, Email : info@olympicbd.com
Telephone : +880-2-9565228,Fax : +880-2-9565555

ThyssenKrupp

99, Kazi Nazrul Islam Avenue,
Dhaka Trade Centre(11th Floor), Kawranbazar, Dhaka-1215.

আসুন, দেশটাকে আরেকটু দৃষ্টিনন্দন করি

ক্রমবর্ধমান দৃশ্যদূষণ এড়ানোর জন্যে আমরা
পার্ক, সড়ক ও অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে
বিলবোর্ড, হোর্ডিং, নিয়ন সাইন ইত্যাদির মাধ্যমে
বিজ্ঞাপন প্রচার করছি না।

Asset DEVELOPMENTS

Asset Developments & Holdings Ltd
Corporate HQ Building
91 Gulshan Avenue, Dhaka 1212, Bangladesh
Tel: (+8802) 55068001-10
e-mail: asset_corporate@asset.com.bd

Touching lives
every day, every moment
Kurkure
SK+F
novo nordisk
ALLERGAN
SERVIER
Mars
SNICKERS
ConAgra Foods
Abbott Nutrition
Schick
EVEREADY
Energizer
L'ORÉAL PARIS
L'ORÉAL
GARNIER
MATRIX
OMRON
Convergent
BMS
Thermo Fisher SCIENTIFIC
TRANSTEC
TRANSCOM DIGITAL
SAMSUNG
HITACHI
Whirlpool
PHILIPS
DAIKIN
প্রথম আলো
KFC
Transcom
Newspapers • Pharmaceuticals • Soft Drinks • Lighting • Consumer Electronics • Restaurants • Distribution • Tea Plantations